দীপবেলাল

ঢাকা গভর্নমেন্ট মুসলিম হাই স্কুল ঢাকা

১৯৮৯

"নওবেলাল"

১৯৮৯ ইং
১৩৯৬ বাং

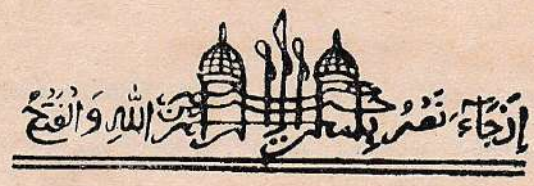

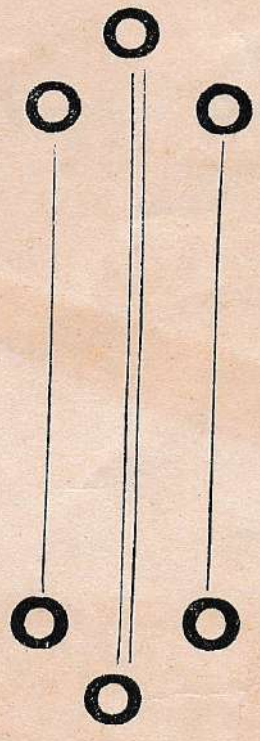

ঢাকা গভঃ মুসলিম হাই স্কুল/বার্ষিকী

প্রকাশনা ঃ
এ, আই, এম, আবদুর রশীদ

সম্পাদনা ঃ
আ, ন, ম, আবদুল মান্নান

ব্লক নির্মানে ঃ
সম্রাট ব্লক প্রসেস
ফকিরাপুল, ঢাকা।

ফটোগ্রাফার্স ঃ
মোঃ আবদুর রব

বাঁধাইয়ে ঃ
মদিনা বাইণ্ডিং
আরামবাগ, ঢাকা—১০০০

মুদ্রণে ঃ
এস, এম, ফরিদ উদ্দীন
আদর্শ প্রিন্টিং প্রেস
২৪, উত্তর শাহজাহানপুর
ঢাকা—১২১৭

মাননীয় মহা-পরিচালকের বাণী

ঢাকা গভর্ণমেন্ট মুসলিম হাইস্কুলের বার্ষিকী "নওবেলাল" প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। বিদ্যালয় বার্ষিকীতে ক্ষুদে কবি-সাহিত্যিকদের আত্মপ্রকাশ ঘটে। ভবিষ্যতের কবি-সাহিত্যিকদের মনোবিকাশের সুযোগ ঘটে এ বার্ষিকীতে। আমি আশা করি এই বিদ্যালয়ের বার্ষিকী প্রকাশনার ভিতর দিয়ে আগামী দিনের জাতীয় পর্যায়ের কবি-সাহিত্যিকের জন্ম হোক।

যাদের লেখা এ বার্ষিকী সমৃদ্ধ ও যাদের অক্লান্ত প্রচেষ্টায় বার্ষিকী প্রকাশিত হলো তাদের জানাই আমার আন্তরিক অভিনন্দন।

আবদুর রশীদ চৌধুরী
মহাপরিচালক
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর
বাংলাদেশ, ঢাকা।

মাননীয় পরিচালকের বাণী

জাতির আশা আকাঙ্খা ও ধ্যান-ধারনার প্রতিফলন হয় তার সাহিত্যে। জাতীয় জীবনে আমাদের উত্থান পতন, প্রেম ভালবাসা, সুখ-দুঃখের কাহিনীই সাহিত্য। বিদ্যালয় বার্ষিকীতে ক্ষুদে সাহিত্যিকদের হাতে খড়ি। এরই মধ্যে ছাত্রদের স্বকীয়তার বিকাশ ঘটে।

ঢাকা গভঃ মুসলিম হাই স্কুলের বার্ষিকী "নও বেলাল" প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। যাদের লেখায় এ বার্ষিকী সমৃদ্ধ এবং যাদের প্রচেষ্টায় বার্ষিকী বের হ'ল, সবাইকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

ডঃ মোঃ মোজাম্মেল হক
পরিচালক (মাধ্যমিক শিক্ষা)
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা
বাংলাদেশ, ঢাকা।

মাননীয় উপ পরিচালকের বাণী

ঢাকা গভঃ মুসলিম হাই স্কুলের বার্ষিকী— "নও বেলাল" হতে যাচ্ছে জেনে আমি খুব আনন্দিত। স্কুল জীবনে বার্ষিকীর ভূমিকা অতীব গুরুত্বপূর্ণ। এটি শিক্ষার্থীর সুপ্ত প্রতিভা বিকাশের একটি প্রধান বাহন।

বার্ষিকীতে যে সকল কচিকাঁচার লেখা স্থান পেয়েছে, তারা অনাগত ভবিষ্যতে বৈজ্ঞানিক, কবি, সাহিত্যিক, রাজনীতিবিদ, সমাজ কর্মী, বুদ্ধিজীবি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে সক্ষম হবে বলে আমার বিশ্বাস।

বার্ষিকীর সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আমি আন্তরিক মোবারকবাদ জানাচ্ছি।

ফজলুল কবির

উপ-পরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর

শিক্ষা ভবন, ঢাকা।

মাননীয়া উপ-পরিচালকের বাণী

আজকের শিশু কিশোররাই আগামী দিনের নাগরিক ও নেতা। এদের সুযোগ্য নেতা ও সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে পাঠক্রমের সঙ্গে নানাবিধ কার্যক্রমে অংশ গ্রহনের সুযোগ দান তাদের সুকুমার বৃত্তি সমূহ বিকাশের পূর্ব শর্ত। ছাত্রদের মানবিক বিকাশে ও মনের ভাবকে ছন্দাবদ্ধ মাধুর্যের শৈল্পিক রূপায়নে বিদ্যালয় বার্ষিকীর অবস্থান সুদূর প্রসারী।

বিদ্যালয় বার্ষিকী শুধু বিদ্যালয়ের মুখপত্রই নয়, এটা স্কুলের দর্পণ ও বটে। ঢাকা গভঃ মুসলিম হাই স্কুলের ম্যাগাজিন "নও বেলাল" এ ক্ষুদে লেখকদের জানাই শুভাশিস এবং সম্পাদনা প্রকাশনার সাথে জড়িত সকলকে জানাই আমার আন্তরিক ধন্যবাদ।

আ, বেগম
উপ-পরিচালক
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা
ঢাকা অঞ্চল, ঢাকা।

মাননীয় উপ পরিচালকের বাণী

ঢাকা গভঃ মুসলিম হাই স্কুলের বার্ষিকী— "নও বেলাল" হতে যাচ্ছে জেনে আমি খুব আনন্দিত। স্কুল জীবনে বার্ষিকীর ভূমিকা অতীব গুরুত্বপূর্ণ। এটি শিক্ষার্থীর সুপ্ত প্রতিভা বিকাশের একটি প্রধান বাহন।

বার্ষিকীতে যে সকল কচিকাঁচার লেখা স্থান পেয়েছে, তারা অনাগত ভবিষ্যতে বৈজ্ঞানিক, কবি, সাহিত্যিক, রাজনীতিবিদ, সমাজ কর্মী, বুদ্ধিজীবি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে সক্ষম হবে বলে আমার বিশ্বাস।

বার্ষিকীর সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আমি আন্তরিক মোবারকবাদ জানাচ্ছি।

ফজলুল কবির

উপ-পরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর

শিক্ষা ভবন, ঢাকা।

মাননীয়া উপ-পরিচালকের বাণী

আজকের শিশু কিশোররাই আগামী দিনের নাগরিক ও নেতা। এদের সুযোগ্য নেতা ও সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে পাঠক্রমের সঙ্গে নানাবিধ কার্যক্রমে অংশ গ্রহনের সুযোগ দান তাদের সুকুমার বৃত্তি সমূহ বিকাশের পূর্ব শর্ত। ছাত্রদের মানবিক বিকাশে ও মনের ভাবকে ছন্দাবদ্ধ মাধুর্যের শৈল্পিক রূপায়নে বিদ্যালয় বার্ষিকীর অবস্থান সুদূর প্রসারী।

বিদ্যালয় বার্ষিকী শুধু বিদ্যালয়ের মুখপত্রই নয়, এটা স্কুলের দর্পণ ও বটে। ঢাকা গভঃ মুসলিম হাই স্কুলের ম্যাগাজিন "নও বেলাল" এ ক্ষুদে লেখকদের জানাই শুভাশিস এবং সম্পাদনা প্রকাশনার সাথে জড়িত সকলকে জানাই আমার আন্তরিক ধন্যবাদ।

আ. বেগম
উপ-পরিচালক
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা
ঢাকা অঞ্চল, ঢাকা।

আমাদের প্রধান শিক্ষক

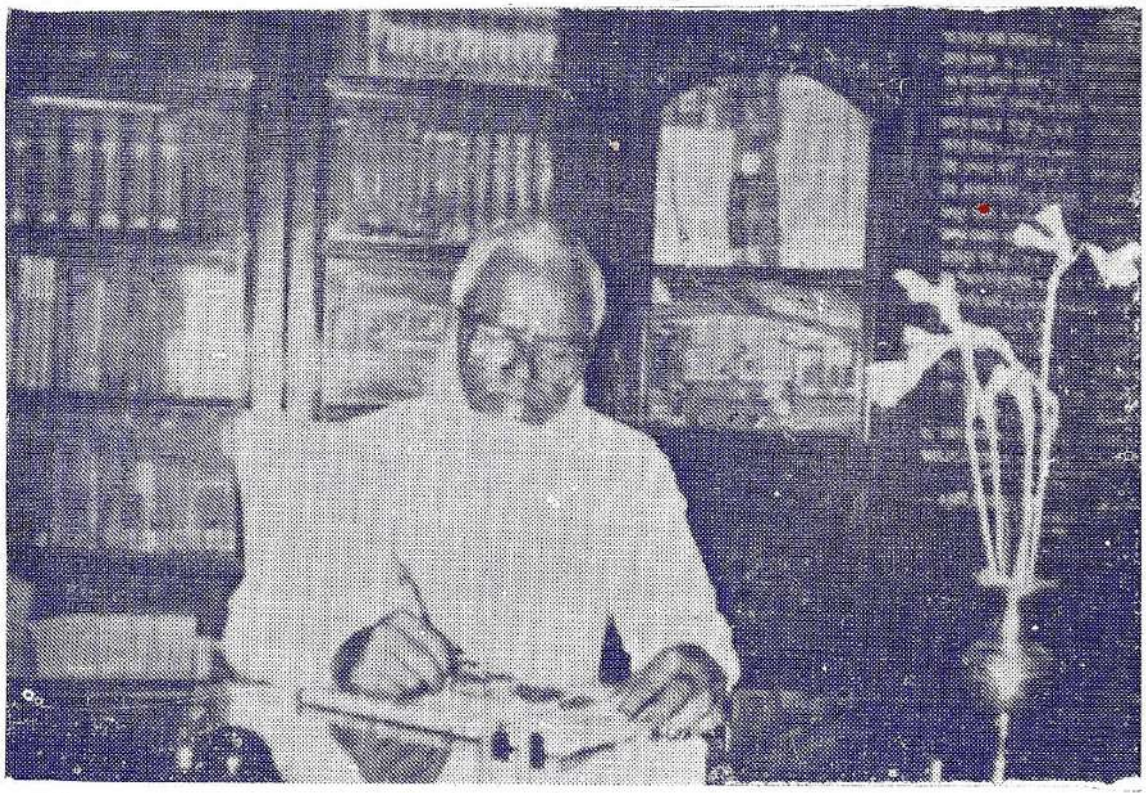

অফিসে কর্মরত প্রধান শিক্ষক

জনাব এ, আই, এম, আবদুর রশীদ

মাননীয় প্রধান শিক্ষকের বাণী

চিন্তা ও চেতনা প্রকাশের দর্পন হচ্ছে বিদ্যালয় বার্ষিকী। আমাদের বিদ্যালয় বার্ষিকী 'নওবেলাল' আত্মপ্রকাশ হতে যাচ্ছে দেখে আমি খুব আনন্দিত। কোমলমতি শিক্ষার্থীদের মানবিক গুনাবলী বিকাশের সর্বোত্তম স্থান বিদ্যানিকেতন। অনুকুল পরিবেশ ও যথাযত পরিচর্যার মাধ্যমে বীজ যেমন ফুলে ফলে পল্লবিত হয়, তেমনি কচিমনের এলোমেলো চিন্তা ও কল্পনা গুলোকে কালির আঁচড়ে সাহিত্য সৃষ্টির সাহায্য করে বিদ্যালয় বার্ষিকীতে। বিপুল সম্ভাবনার অধিকারী বাঙালী জাতির আশা আকাঙ্খার প্রতিচ্ছবি, অনাগত ভবিষ্যতের কাণ্ডারী, যারা এ বার্ষিকীর মাধ্যমে নিজেদের প্রকাশ করছে, আশা করি তাদের মধ্য থেকে বের হয়ে আসবে দেশ বরন্য কবি-সাহিত্যিক ও দার্শনিক।

প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকে এর স্বাক্ষর বহন করছে শিক্ষার্থীরা তাদের সৃষ্টিধর্মী প্রতিভার মাধ্যমে। তাঁদের মধ্যে ইউনেস্কোর কলিঙ্গ পুরস্কার বিজয়ী ডঃ আবদুল্লাহ্ আল্ মুতী শরফুদ্দীনের নাম অবিস্মরণীয়। এমনি বহু গুনী ও জ্ঞানী উপহার দিয়েছে এ বিদ্যানিকেতন। তাঁদেরকে আন্তরিকতার সাথে স্মরণ করছি।

বার্ষিকী সম্পাদনা পরিষদ, শিক্ষক শিক্ষিকা ও অন্যান্য যারা 'নওবেলাল' প্রকাশনায় সহযোগীতা ও সক্রিয় ভুমিকা পালন করেছেন, তাঁদের সবাইকে জানাই আন্তরিক মোবারকবাদ।

এ, আই, এম, আবদুর রশীদ
প্রধান শিক্ষক

সম্পাদকীয়

সময় কারো জন্য অপেক্ষা করে না। এর গতি কখনও থামেনি। আবহমান কাল থেকে একই গতিতে চলছে তো চলছেই। কবির ভাষায়—

"দিন যায় ক্ষন যায় সময় কাহার নয়
বেগে ধায় নাহি রয় স্থির।"

সুতরাং গতানুগতিক কাজের ব্যস্ততা ও নানা প্রতিকুল অবস্থার প্রেক্ষিতে একটি বছর অতীতের গর্ভে বিলীন হয়ে গেল। কিন্তু আমাদের ঐতিহ্যবাহী ঢাকা গভঃ মুসলিম হাই স্কুলের বার্ষিকী "নওবেলাল" প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি। বহু প্রতীক্ষার পর স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকার সহযোগিতা ও ছাত্রদের ঐকান্তিক চেষ্টা ও প্রত্যাশাকে সামনে রেখে ১৯৮৯ সালের বার্ষিকী আত্মপ্রকাশ করতে যাচ্ছে। মহান আল্লাহ পাকের অসীম রহমতে বার্ষিকীটি ছাত্রদের হাতে তুলে দিতে পেরে শুকরিয়া আদায় করছি আল্লাহর দরবারে।

ডঃ মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ বলেছেন :—"মাতা ও মাতৃভাষা আর মাতৃভূমি প্রত্যেক মানুষের শ্রদ্ধার বস্তু।" বাংলা আমাদের মাতৃভাষা। কথাবার্তা চিন্তা কল্পনা ইত্যাদি বাংলা ভাষার মাধ্যমেই আমাদের মনের মনিকোঠায় ভীড় জমায়। পরিশেষে ভাব বিনিময় বা লেখনীর পরশে কালির অক্ষরে প্রকাশ পায়। মাতৃভাষার প্রতি সকল কালের সকল মানুষের আজীবন শ্রদ্ধা রয়েছে। আল্লাহ পাক নবী-রাসূলগনকেও তাদের নিজ নিজ মাতৃভাষায়ই ধর্ম প্রচারের নির্দেশ দিয়েছেন। এটাই মাতৃভাষার প্রতি শ্রদ্ধাবোধের প্রকৃষ্ট প্রমান।

লেখাপড়ার সাথে সাথে সাহিত্য-সংস্কৃতি কর্মকাণ্ডে ও আমাদের ছাত্ররা সমান পারদর্শী। পূর্ব ঐতিহ্যের ধ্বজা ধরে এবারের বার্ষিকী প্রকাশনায় আমাদের সবুজ-অবুজ কঁচিকাঁচা ছাত্রদের তরফ থেকে বিপুল সাড়া পাওয়া গিয়েছে। লেখার মানবিচারে এবং আর্থিক অসুবিধার দরুন সকলের লেখা ছাপানো সম্ভব হয়ে উঠেনি। যাদের লেখা ছাপানো হয়েছে তা ও যে জড়তা বর্জিত বা কলুষমুক্ত সেই কথা জোর দিয়ে বলা যায় না। হাঁটি হাঁটি পা পা করেই সামনের দিকে অগ্রসর হতে হয়। এটাই স্বাভাবিক নিয়ম ও বাস্তব সত্য। কেননা "হাঁটিতে শিখে না কেউ না খেয়ে আছাড়" তবে এদের মধ্যে কবি-সাহিত্যিক ও দার্শনিকের সুপ্ত প্রতীভা যে বিদ্যমান তা অস্বীকার করার উপায় নেই। এ বার্ষিকী প্রকাশনা তাদের সুপ্ত প্রতীভা বিকাশের ক্ষুদ্র প্রয়াশ মাত্র।

বার্ষিকী প্রকাশের আবশ্যকতা এবং ছাত্রদের দীর্ঘদিনের চাহিদার কথা স্মরণ করে ছাত্র শিক্ষক ও শিক্ষিকাদের সহযোগিতার দরুনই 'নওবেলাল' করা সম্ভব হয়েছে। সেই জন্য সম্পাদনা পরিষদের নিঃস্বার্থ প্রয়াশ মাননীয় প্রধান শিক্ষকের পৃষ্ঠপোষকতা, শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং ছাত্রদের আন্তরিকতাকে আমি কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করছি।

হয়তো সমালোচনার কবল থেকে রেহাই পাবে না এ বার্ষিকী। তথাপি পাঠককুলের হাতে তুলে দিলাম বার্ষিকী। অসাবধানতা হেতু ভুল-ভ্রান্তি বা প্রিন্টিং প্রমাদ থাকা বিচিত্র নয়। সুধীমণ্ডলী তা ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন এই প্রত্যাশা রেখেই শেষ করছি। আল্লাহ হাফেজ। বাংলাদেশ জিন্দাবাদ।

আ. ন. ম. আবদুল মান্নান
বার্ষিকী সম্পাদক

ঢাকা গভঃ মুসলিম হাই স্কুল, ঢাকা

জ্ঞানের মশাল জ্বালছেন যাঁরা

	নাম—	যোগ্যতা	যোগদানের তারিখ
১।	প্রধান শিক্ষক ঃ জনাব এ, আই, এম, আবদুর রশীদ	বি, এস, সি, বি এড বি, সি, এস (শিক্ষা)	১৪-১-৮৭ ইং
২।	সহঃ প্রধান শিক্ষিকা ঃ ,, শামসুন নাহার বেগম	বি, এ, বি এড,	১৫-৪-৮৯ ইং
	শিক্ষক (বিষয়ভিত্তিক) ঃ		
৩।	জনাব সিরাজ উদ্দিন আহমদ	এম, এ, বিএড্	৩-৪-৬৯ ইং
৪।	,, ওবায়দুল হক মিয়া	বি, এ, এম এড্	১৬-৬-৭৬
৫।	,, আবুল হোসেন	বি, এস, সি, বি এড	২৫-৮-৭০
৬।	,, এ, কে, এম, গোলাম মোস্তফা	বি এস সি, এম এড্	১১-১০-৮২
৭।	,, মোঃ ইদ্রিস খান	বি এ, বি এড্	২৮-৭-৬৬
৮।	,, আঃ লতিফ হাওলাদার	বি এস সি, এম এড	১৮-৯-৮৯
৯।	,, আ, ন, ম, আবদুল মান্নান	এম, এম, আদির-ই-কামিল, এম এ, বি এড	১৩-৫-৭২
১০।	,, মিসেস শামসুন নাহার	বি এ, বি-এড্	১-৯-৮৩
১১।	,, আবদুল জাব্বার ভূঁইয়া	বি এ, বি-এড্	৯-১-৮৫
১২।	,, আবদুল মজিদ তালুকদার	বি এস সি, বি-এড	৭-৭-৮৫
১৩।	,, আবদুল মজিদ	ডিপ-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং	১৫-২-৭৩
১৪।	,, আবদুল লতিফ	বি এ (অনার্স) এম, এ, এম এড্ ডিপ-ইন-এড্ সি-ইন-এড এম-এড	১১-৭-৮৭
১৫।	,, মোঃ মোসলেম উদ্দীন খান (হেড্ মৌলভী)	এম, এম, এম, এ, বি-এড	২৯-৭-৮৭
১৬।	,, মোঃ রাজ্জাকুল হায়দার	বি, এ, (অনার্স) এম, এ,	৩০-১-৮৬
	সহকারী শিক্ষক ঃ		
১৭।	জনাব এ, এফ, এম, নাসিরুল হক তালুকদার	এফ, এম	১২-৮-৬৬
১৮।	,, জিয়াউদ্দীন আহমেদ	ডিপ-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং	২৩-৮-৮৩
১৯।	,, জিনাতুন্ নেছা	এম, এ (বাংলা) এম এড্	৮-১২-৮৬

নওবেলাল/

সহকারী শিক্ষক	যোগ্যতা	যোগদানের তারিখ
২০। জনাব আনসার উদ্দীন সিকদার	এম, এ (অর্থনীতি) এম এড	১-৩-৮৭ ইং
২১। „ বি, এম, মাহফুজা আখতার	এম, এ, ডিপ-ইন-এড্	১১-২-৮৭
২২। মিসেস আফিয়া খাতুন	বি এ (সম্মান) এম, এ, বি-এড	১৮-২-৮৭
২৩। „ শাহানা নাসরীন	বি-এ, বি এড	১৮-২-৮৭
২৪। „ রওশন আরা	বি, এ, বি-এড	১২-১১-৮৯
২৫। „ আনোয়ারা খাতুন	বি, এ, (অনার্স-অর্থনীতি) বি-এড	০৪-৩-৮৭
২৬। জনাব ওয়াদুদ খান	বি, এস, সি, বি-এড	২২-৩-৮৭
২৭। মিসেস আমেনা খানম	বি, এ, বি-এড, এম এড	৭-৭-৮৯
অফিস সহকারী ঃ		
১। জনাব সুলতান আহমদ	এস, এস, সি	১৬-৪-৮৯ ইং
২। „ ফেরদাউস খান	আই, এ	১৯-১-৮৮
চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী ঃ		
১। জনাব আবদুছ সামাদ		১-১-৭৬-
২। „ সৈয়দ আহমদ চৌধুরী		২৬-৯-৭২
৩। „ মোঃ ইউসুফ		১-১-৮৫
৪। „ মোঃ হাসান	৮ম — শ্রেণী	১-১-৫৪
৫। „ আবদুল মোতালেব	৫ম — শ্রেণী	৬-৮-৬৩
৬। „ মোঃ শাহজাহান	এস, এস, সি	১-৬-৭৯
৭। „ সাইজ উদ্দিন	এস, এস, সি	১-৬-৭৯
৮। „ আবুল হাসেম	দশম—শ্রেণী	২০ ১২-৮৩
৯। „ আবু বকর সিদ্দিক	৫ম—শ্রেণী	১ ১-৬৯
১০। „ মোঃ মুতিয়ার রহমান	৯ম — শ্রেণী	২৪-১২-৬৯
১১। „ মোঃ ফজল হক	৫ম—শ্রেণী	৯-৫-৭৫

★ উল্লেখিত দুইজন সহকারী শিক্ষক ডেপুটেশনে কার্যরত।

নওবেলাল/

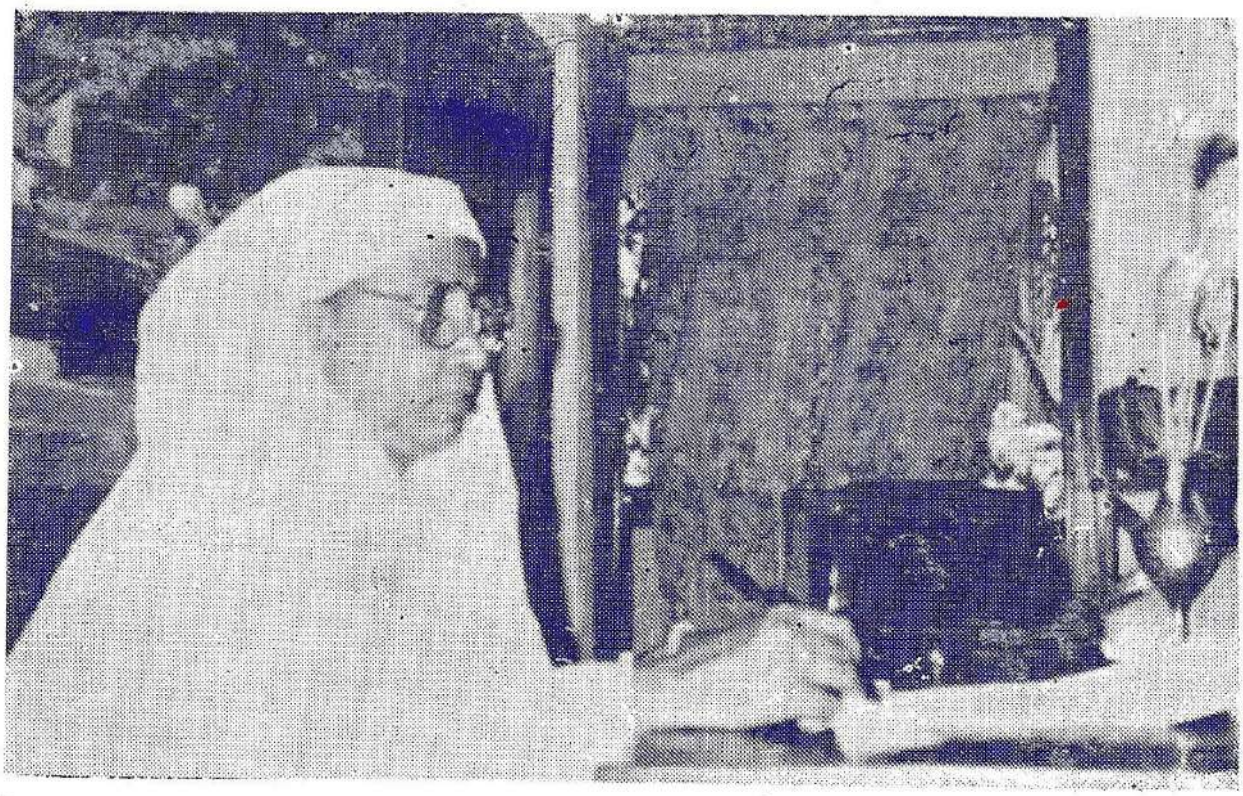

শামসুন নাহার বেগম

কর্মরত সহকারী প্রধান শিক্ষিকা

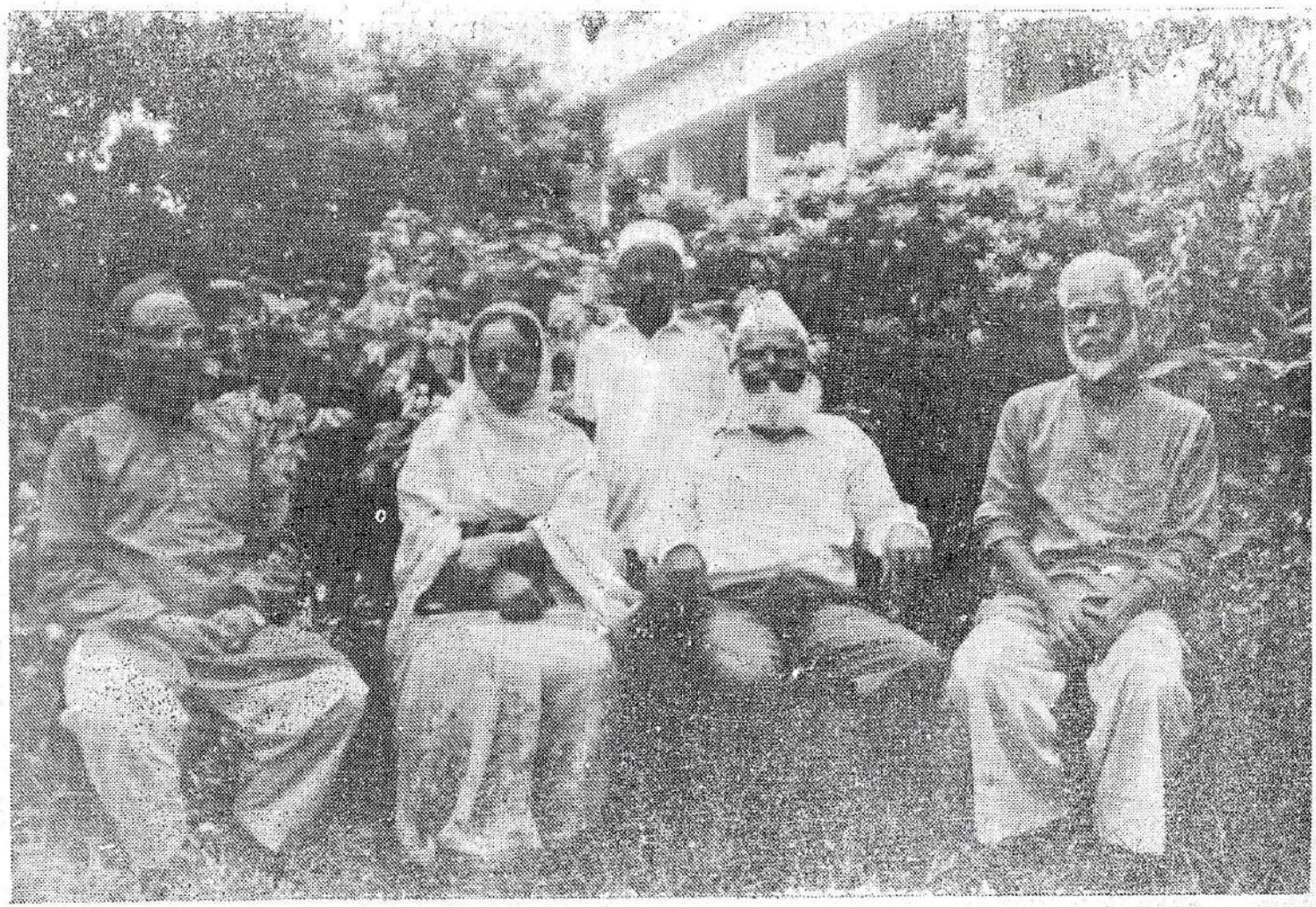

বামে সম্পাদক ঃ সর্বজনাব আঃ মান্নান, শাহানা নাসরিন, প্রধান শিক্ষক, ইদ্রিস খান
পিছনে দাড়ানো ঃ মাঈন উদ্দিন (৭ম শ্রেণী)

প্রধান শিক্ষকের সাথে ঃ শিক্ষক-শিক্ষিকা ও কর্মচারী বৃন্দ

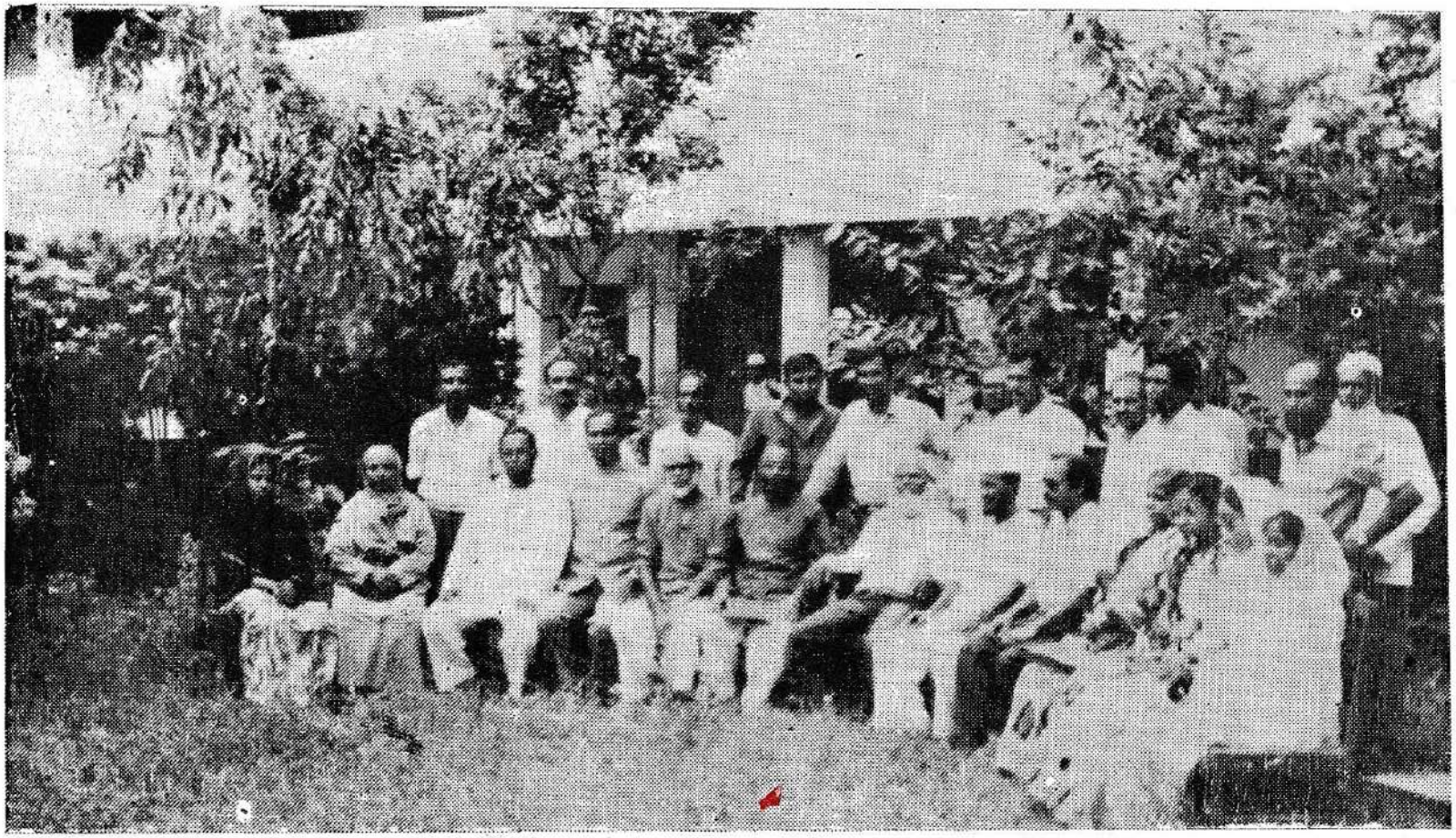

বাম-দিক হইতে ডানে চেয়ারে বসা ঃ মিস্ জিন্নাতুন নেছা, শামসুন নাহার বেগম, হেড মৌঃ—মোসলেম উদ্দিন, জনাব আঃ জব্বার, জনাব ইদ্রিস খান, জনাব আঃ মান্নান, এ, আই, এম, আঃ রশীদ (প্রধান শিক্ষক), জনাব সিরাজ উদ্দিন, জনাব গোলাম মস্তোফা, মিস্ আমেনা খাতুন, বি, এম, মাহফুজা আক্তার, মিস্ শাহানা নাসরিন, মিস্ আনোয়ারা খাতুন।

পিছনে দাড়ানো বাম থেকে ডানে : শিক্ষক ও কর্মচারী বৃন্দ : সুলতান আহমেদ (উচ্চমান সহকারী), আঃ মজিদ তালুকদার, আঃ ছামাদ (পিয়ন), জিয়াউদ্দিন, আঃ লতিফ, আঃ মজিদ (শিল্পকলা), ফেরদৌস খান, (নিম্নমান সহকারী), শাহজানান (দফ্তরবাহক) আনসার সিকদার, ইউসুফ (দারোয়ান), আবুল হাশেম (অর্ডারলী)।

বার্ষিকী পরিষদ

★ প্রধান উপদেষ্টা ও পৃষ্ঠপোষক—	জনাব এ, আই, এম, আবদুর রশীদ	প্রধান শিক্ষক
★ উপদেষ্টা—	মিসেস শামসুন নাহার বেগম	সহকারী প্রধান শিক্ষিকা
* সম্পাদক—	জনাব আ, ন, ম, আবদুল মান্নান	শিক্ষক (বিষয়ভিত্তিক)
* সদস্য—	,, সিরাজ উদ্দিন আহমদ	,,
* ,, —	,, ওবায়দুল হক মিয়া	,,
* ,, —	,, ইদ্রিস খান	,,
* ,, —	মিসেস শাহানা নাসরীন	,,
* সহকারী সম্পাদক—	জনাব কবির উদ্দিন সরকার (কনক)	দশম শ্রেণী
* সদস্য —	,, আবু জাফর	নবম শ্রেণী
* ,, —	,, রফি উদ্দিন আহমেদ	৭ম শ্রেণী
* ,, —	,, মঈন উদ্দিন	৭ম শ্রেণী
* ,, —	,, শামসুর রহমান	৬ষ্ঠ শ্রেণী
		৭ম

নওবেলাল/

ঢাকা গভঃ মুসলিম হাই স্কুল/বাষিকী

আমাদের স্কুলের এস, এস, সি পরীক্ষার ফলাফল

নিম্নের 'ছক' ১৯৮৭—৮৯ সাল পর্যায় এস. এস. সি পরীক্ষার ফলাফল দেওয়া হইল—

সাল	বিভাগ	১ম বিভাগ	২য় বিভাগ	৩য় বিভাগ	স্টার	স্ট্যাণ্ড	মন্তব্য
১৯৮৭	মানবিক	০২	০৬	×	×	×	
১৯৮৭	বিজ্ঞান	২১	২৩	×	৩	×	
১৯৮৮	মানবিক	০৫	১০	×	×	×	
১৯৮৮	বিজ্ঞান	২৮	১৪	×	৭	×	
১৯৮৯	মানবিক	০৩	১৩	×	×	×	
১৯৮৯	বিজ্ঞান	৪২	৫	×	৭	×	

সূচী পত্র

বিষয়	লেখক		পৃষ্ঠা নং
লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্‌র—	রুহুল আমিন	৯ম শ্রেণী	১
রাষ্ট্র পরিচালনায় মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ)—	মুহম্মদ মাসউদ নোমানী	,, ,,	২
এলমে দ্বীন হাসিলের গুরুত্ব—	ওবায়দুল হক মিয়া	সহঃ শিক্ষক	৫
আন্তর্জাতিক ফুটবলে বাংলাদেশ—	মোঃ কবির উদ্দীন সরকার (কনক)	দশম শ্রেণী	৮
হ্যালির ধূমকেতু—	গোলাম দাস্তেগীর	৮ম শ্রেণী	১০
শিক্ষকের প্রতি শ্রদ্ধা—	আ, ন, ম আবদুল মান্নান	সহঃ শিক্ষক	১২
কৌতুক নক্‌শা—	মোঃ শাহীনুর হাসান	৮ম শ্রেণী	১৫
কৌতুক—	মাসুদ পারভেজ	৯ম ,,	১৭
স্মৃতি চারণ—	মোঃ আবুল কালাম আজাদ	৮ম ,,	১৮
মুজাদ্দিদে আলফেসানী—	মোঃ মোসলেম উদ্দীন খান	সহঃ শিক্ষক	১৯
যুদ্ধ এবং অস্ত্র—	মোঃ শহীদুল আলম	৮ম শ্রেণী	২১
বন্যা—	আশরাফী সায়েদুল মোরসালীন	,, ,,	২৩
তরুন সমাজের অবক্ষয়ের কারণ ও তার প্রতিকার—	শাহানা নাসরীন	শিক্ষিকা	২৫
ডাইনোসরকে জানো—	মনিরুজ্জামান	৮ম শ্রেণী	২৮
ভিটামিন 'সি'—	মোঃ সালাহ উদ্দীন	দশম ,,	২৯
প্রসঙ্গ ক্যান্সার—	মীর মোঃ জয়নাল আবেদীন	,, ,,	৩৩
নিরক্ষরতা দূরীকরণ—	মো: আনছার শিকদার	সহঃ শিক্ষক	৩৫
আজব চিকিৎসা—	মোঃ মঈনুল ইসলাম	৮ম শ্রেণী	৩৮
বাঁচানোর ফল—	মো: খন্দকার জাকারিয়া	৬ষ্ঠ ,,	৪০
দুই ভাই—	মো: ফজলুল করিম খান	দশম ,,	৪২
ইসলামে পর্দা প্রথার গুরুত্ব —	শামসুন নাহার বেগম	সহঃ প্র: শিক্ষিকা	৪৩
জানা অজানা—	খ, ম, সাইদুর রহমান শ্যামল	৯ম শ্রেণী	৪৬
জানা অজানা—	মোঃ আমির হোসেন	দশম ,,	৪৭
ছড়া ও কবিতা গুচ্ছ :			
মুসলিম (গভঃ) উচ্চ বিদ্যালয়—	কাজী মো: মোস্তাফিজুর রহমান (রিমু)	৭ম ,,	৪৯
১৯৮৮ সনের বন্যা—	মো: নূরুজ্জামান	দশম ,,	৫০
খোজে—	মো: মাসুদুজ্জামান	পঞ্চম ,,	৫১
আমাদের দেশ—	কাজী মফিজুল ইসলাম	৬ষ্ঠ ,,	,,
গোলমাল—	মোঃ রফিকুল ইসলাম	৮ম ,,	,,
ফুটবল—	মোঃ তৌফিকুল ইসলাম	৯ম ,,	৫২
জাগরে মুসলমান—	তারিয়াম জমসীদ	দশম ,,	,,

নও বেলাল/

বিষয়	লেখক		পৃষ্ঠা নং
কৃষকের ভাগ্য—	শেখ মোঃ শাহিন	৮ম শ্রেণী	৫৩
তিনটি ছড়া—	নোঃ তুহিনুর হাসান	৬ষ্ঠ ,,	,,
কবি—	মোঃ কাজী ওমর ফারুক	৬ষ্ঠ ,,	৫৪
রহমত আলী—	মোঃ ফারুক হোসেন	৭ম ,,	,,
বিড়াল ছানা —	মোঃ জামাল	৬ষ্ঠ ,,	৫৫
অন্ধের হাতে বাতি—	আ, ন, ম আবদুল মান্নান	শিক্ষক	,,
ঢাকায় থাকি—	এস, এম, আরীফ হোসেন	৫ম শ্রেণী	,,
ঘুড়ি—	শেখ মসিউল হক	৮ম ,,	৫৬
ভেজাল—	এ, বি, এম, সিদ্দিকী	৮ম ,,	,,
পথকলি—	ডি, এম, রাজিবুল আলম	৮ম ,,	,,
একুশে স্মরণে —	মোঃ শাহাদৎ হোসেন (শান্ত)	৮ম ,,	৫৭
দেশপ্রেম—	মোঃ নাজমুল ইসলাম খান (সংগ্রাম)	দশম ,,	,,
স্বাধীনতা তুমি—	মোঃ শামীম আলম	৮ম ,,	,,
বন্যা—	মোঃ জাকির হোসেন (তারিক)	৮ম ,,	৫৮
আমি এক শিশু—	মোঃ মিরাজ উদ্দীন	৯ম ,,	,,
বল আমার বল—	মোঃ সাঈদ সালাহ উদ্দীন	৫ম ,,	,,
স্মরণীয় ২১শে ফেব্রুয়ারী—	মোঃ সালাহ উদ্দীন	দশম ,,	৫৯
দাদুর গল্প—	মোঃ মাসউদ নোমানী	নবম ,,	,,
এলোমেলো ছড়া—	চৌধুরী নাফিজ সারাফাত—	৬ষ্ঠ ,,	৬০
বনের পাখী—	সৈয়দ মাহবুব-উর রহমান	৬ষ্ঠ ,,	,,
শহর—	মোঃ ইউসুফ ইবনে ইসলাম	৭ম ,,	৬১
বসন্ত—	মাহ শুকুর রহমান চিশতী	৫ম ,,	,,
দেশ প্রেম—	মোঃ নাজমুল ইসলাম খান	৮ম ,,	,,
ধাঁ ধাঁ—	শেখ ইমতিয়াজ নুর	৬ষ্ঠ ,,	৬২
ধাঁ ধাঁ—	চৌধুরী নাফিজ সরাফাত	৬ষ্ঠ ,,	৬৩
ইংরেজী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা—	সিরাজ উদ্দীন আহমদ	সহঃ শিক্ষক	৬৪
Some useful Aphorisms—	সৈয়দ হাসান আতিক	দশম শ্রেণী	৬৬
Some Quatations—	Md. Sala uddin	দশম ,,	৬৭
Classification of Parts of Speech—			৬৮
'৮৯ সনে স্কাউটদের কর্মতৎপরতা—	মোঃ আরিফ	৮ম ,,	৬৯
হাতের লেখার গুরুত্ব—	ওবায়দুল হক মিয়া	শিক্ষক	৭০
স্কুল পরিক্রমা—			৭৩

নও বেলাল/

বিদ্যালয়ের মাঠে জাতীয় সংগীতে দাড়ানো ছাত্রদের একাংশ

বিজ্ঞানাগার (ল্যাবরেটরী ভবন)

ঢাকা গভঃ মুসলিম হাই স্কুল

লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্'র

রুহুল আমিন
নবম শ্রেণী, শাখা (ক)
ক্রমিক নং—১

"ইলাহ্" বলতে কি বুঝায়, সবার আগে তাই বুঝে নিতে হবে। আরবী ভাষায় 'ইলাহ্' শব্দের অর্থ হচ্ছে ইবাদতের যোগ্য ঃ অর্থাৎ শ্রেষ্ঠত্ব, গৌরব ও মহত্বে যে সত্তা উপাসনার যোগ্য হবে এবং বন্দেগী ও ইবাদতের ক্ষেত্রে যার নিকট মস্তক অবনমিত করা যা, 'ইলাহ্' শব্দের অর্থে এ তাৎপর্য ও শামিল রয়েছে যে, তাকে হতে হবে অনন্ত শক্তির আধার, যে শক্তির উপলব্ধি মানুষের সীমাবদ্ধ জ্ঞানবুদ্ধির সীমানা অতিক্রম করা যায়। ইলাহ্ শব্দের অর্থ হলো ইহাও যে তিনি কারুর মুখাপেক্ষী হবেন না, অথচ সকল ব্যাপারে সবাই তার মুখাপেক্ষী হবে। 'ইলাহ্' হলো সেই সত্তা যার মধ্যে থাকবে রহস্যের আবরণ। ফারসী ভাষায় 'খোদা' হিন্দী ভাষায় দেবতা ও ইংরেজী ভাষায় গড শব্দ ও এর কাছাকাছি অর্থে ব্যবহৃত হয়।

'আল্লাহ' শব্দটির অর্থ হচ্ছে একক -- লা শরীক আল্লার 'ইসমে জাত' বা মৌলিক নাম, মুল সত্তার পরিচায়ক নাম। 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' কথাটির শব্দগত তরজমা হলো কোন ইলাহ নেই সেই বিশেষ সত্তা ব্যতীত যার নাম হলো আল্লাহ্ এর প্রকৃত তাৎপর্য হলো, সমগ্র সৃষ্টিজগতে আল্লাহ ব্যতীত এমন আর কোন সত্তার অস্তিত্ব নেই যে উপাসনার যোগ্য হতে পারে। তিনি ছাড়া এমন কোন সত্তা নেই যে মানুষের ইবাদত বন্দেগী ও আনুগত্য পাওয়ার অধিকারী। তিনি সমগ্র জাহানের একমাত্র সত্তা, মালিক ও বিধানকর্তা সব কিছুই তার মুখাপেক্ষী। তার কাছে আশ্রয় ও সাহায্য কামনায় বাধ্য। তার অস্তিত্ব অনুভব করতে গিয়ে মানুষের জ্ঞান বুদ্ধি ব্যর্থ হয়।

* নিশ্চয়ই কাজের ফলাফল নিয়্যাতের উপর নির্ভরশীল। (বুখারী)

রাষ্ট্র পরিচালনায়
মহানবী হযরত মুহাম্মদ (দঃ)

মুহাম্মদ মাসউদ (নোমানী,
নবম শ্রেণী, 'খ' শাখা

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (দঃ) এর আবির্ভাবের পূর্বে জগতে যে অবস্থা বিরাজ করছিল, তা ছিল বিশৃঙ্খলার এক চরম পর্যায়। যখন বর্বরতা ও পশুত্ব ছড়িয়ে গিয়েছিল পৃথিবীর সর্বত্র। আর তখন এক দল অন্যদলের রক্ত পানের জন্য তৃষ্ণার্ত হয়ে পড়েছিল, নিয়ম শৃঙ্খলার কোন নাম গন্ধ অবশিষ্ট ছিল না। কারো মধ্যে কোন আগ্রহ দেখা যায়নি যে, সে মানবতাকে নিশ্চিত ধ্বংশের হাত থেকে রক্ষা করবে। এমনি যুগ সন্ধিক্ষণে আগমন করেন মহানবী (দঃ)। তিনি স্বীয় সংস্কারমূলক পরিকল্পনা নিয়ে অগ্রসর হন। জগতের এমন কোন গোত্র, জাতি বা দেশ তার দাওয়াত থেকে বাদ পড়েনি। কেননা তিনি গোটা বিশ্বকে সত্যের পথ দেখিয়েছেন।

মহানবী (দঃ) এক বিপ্লবাত্মক ঘোষনায় বলেছেন—"এক আল্লাহ পাকই সকলের শ্রষ্ঠা ও পালনকর্তা। সব মানুষ ভাই ভাই। কোন আরবের উপর অনারবের কিংবা কোন অনারবের উপর আরবের শ্রেষ্ঠত্ব নেই।

মহানবী (দঃ) দেশ জাতি বর্ণ ও বংশের পার্থক্য থাকা সত্বেও সকল মানুষকে এক অভিন্ন ভাতৃত্বের সূত্রে গ্রথিত বলে ঘোষনা করেছেন। মহানবী (দঃ) মানুষের উপর মানুষের শাসনকে অবৈধ বলে ঘোষনা করেছেন আর প্রকৃত শাসন কর্তা যে আল্লাহ পাক এ কথাও তিনি সুস্পষ্ট ভাবে ঘোষনা করেন।

একটি রাষ্ট্রের সর্বেসর্বা হয়ে, রাষ্ট্র প্রধান হয়েও অনেক সম্পদ তার পদতলে নিত্য সমর্পিত হওয়া সত্ত্বেও তিনি কখন ও বিলাস ব্যসনে গা ঢেলে দেননি। রাষ্ট্র প্রধান হিসাবে বঞ্চিত মানুষের অভাব অনটন মোচনের দায়িত্ব মানব ইতিহাসে তিনিই সর্ব প্রথম গ্রহণ করেছেন। রাষ্ট্রপ্রধান হওয়ার পর ও এমন বহু দিন গেছে যখন তার ঘরে চুলাও জ্বলেনি। দিনের পর দিন ভূখা থেকে সামান্য খাবার তার সামনে হাজির করা হয়েছে। এমন সময় অনাহারী মানুষের কথা শুনে অম্লান বদনে সেই খাদ্য দিয়ে দিয়েছেন। এমন নজীর তার জীবনে ছিল অসংখ্য।

শ্রমের মাধ্যমে জীবিকা অর্জন ছিল তার অত্যন্ত প্রিয়। কৃষিক্ষেত্রে পানি দেওয়া, কাপড় সেলাই করা, জুতা মেরামত থেকে শুরু করে ময়লা সাফ করা কোন কাজই তিনি ঘৃনা করেননি।

ঢাকা গভর্নমেন্ট মুসলিম হাইস্কুল বার্ষিকী

ইসলাম প্রচার করতে গিয়ে নবীজী বহু শত্রুর নির্যাতন ব্যঙ্গ বিদ্রুপ ও কষ্ট সহ্য করেছেন তার ইয়ত্তা নেই। ছোট বড় শিক্ষিত-অশিক্ষিত, ধনী-গরীব সকল মানুষকে ভাই বলে বুকে তুলে নেওয়ার অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন তিনি। অন্যকে ভালবাসা, দুঃখি মানুষের জন্য প্রকৃতি দরদ অনুভব, বিপন্ন মানুষের সাহায্যে সর্বদা এগিয়ে যাওয়া, মানুষকে সর্বতভাবে সেবা করা ছিল তার আদর্শ। প্রতিবেশীর খোঁজ-খবর নিয়ে সাহায্যের জন্য ত্যাগ স্বীকার করা ছিল অন্যতম আদর্শ।

ইসলাম সামাজিক শৃঙ্খলার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। সম্পদ শালীকে সম্পদের মালিক না বানিয়ে বরং তার রক্ষক সাব্যস্ত করেছেন। কেননা সব কিছুর মালিক একমাত্র আল্লাহ-তাআলা। সম্পদের ব্যয় করার জন্য ও নিয়ম-কানুন নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। অপব্যয় কারীকে আল্লাহ পাক সয়তানের ভাই বলে উল্লেখ করেছেন।

পবিত্র কুরআনে এরশাদ হচ্ছে—ইসলামী সরিআত পুঁজিবাদের সীমানা নির্ধারণ করে দিয়েছেন। আর এমন নিয়ম-কানুন নির্ধারণ করে দিয়েছেন যার ফলে সম্পদ শুধু গুটি কতক বৃত্তশালীদের মাঝে সীমাবদ্ধ থাকবেনা। বরং তা সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়বে যাকাত ও ছাদকার মাধ্যমে।

মহানবী (দঃ) একটি আদর্শ রাষ্ট্র ও একটি আদর্শ সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। একাধারে রাষ্ট্র, ধর্ম ও সমাজ প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে তাঁর সমতুল্য আর দ্বিতীয় ব্যক্তির সন্ধান ইতিহাসে নেই। তদুপরি তিনি ছিলেন নিতান্ত দরিদ্র ও অসহায় পরিবারের সন্তান। আল্লাহ-পাক কুরআনে তাঁর সম্পর্কে বলেছেন — হে মুহাম্মদ (দঃ) আমি কি আপনাকে অনাথ অবস্থায় পেয়ে আশ্রয় দান করিনি। আমি কি আপনাকে পথহারা পেয়ে সৎপথ প্রদর্শন করিনি। আমি কি আপনাকে দুর্দশা গ্রস্থ পেয়ে সম্পদ দান করিনি।

মহানবী (দঃ) রাষ্ট্র পরিচালক হিসাবে ছিলেন অত্যন্ত দূরদর্শী ও বিচক্ষন। সে সময়ে মদীনার আশেপাশে মুসলমান, খ্রীষ্টান, ইহুদী প্রভৃতি সম্প্রদায়ের লোকেরা বসবাস করতো। তিনি ইসলামী রাষ্ট্রের বুনিয়াদ সুদৃঢ় করার জন্য ঐ সমস্ত সম্প্রদায়ের সহযোগিতা এবং সমঝোতার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন এবং তাদের পরস্পরের মধ্যে সম্প্রীতি ও সৌহার্দ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তিনি একটি লিখিত সনদ বা প্রতিরক্ষার চুক্তি সম্পাদন করেন। ইহা মদীনার সনদ নামে খ্যাত। উক্ত সনদে ৪৭টি ধারা ছিল। এ সনদই প্রমান করে যে মহানবী (দঃ) রাষ্ট্র পরিচালনায় একজন সুদক্ষ রাষ্ট্র নায়ক এবং সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। উক্ত সনদে ধর্মের ব্যাপারে যে উদার নীতির পরিচয় দেন তা বিশ্বের ইতিহাসে এক যুগান্তকারী ঘটনা। তিনিই সর্বপ্রথম ইসলামী গণতন্ত্রের বীজ বপন করেন। এই সনদই ছিল সর্বপ্রথম এবং সর্বকালের সর্বজন সমর্থিত সংবিধান। এই সংবিধানের নীতি ও আদর্শের আলোকেই তিনি রাষ্ট্র পরিচালনার যাবতীয় বিধি-বিধান রচনা করেন। পবিত্র কুরআন শরীফে নির্দেশ, নিজের বিবেক বিবেচনা এবং সাহাবাগনের মতামত অনুযায়ী শাসনকার্য পরিচালনা করতেন। ফলে তিনি

বিশৃঙ্খলার ও প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে দিয়েও একটি ঐক্যবদ্ধ জাতি শক্তিশালী রাষ্ট্র গঠনে সক্ষম হয়েছিলেন। রাষ্ট্র পরিচালনায় তার অসাধারণ কৃতিত্বের কথা অমুসলীম ঐতিহাসিকগণও মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করেছেন।

সম্প্রতি আমেরিকার বিশিষ্ট গবেষক ও মনীষী মাইকেল এইচ হার্ট একখানি গ্রন্থে বিশ্বের সর্ব-যুগের সর্বাদিক প্রভাবশালী একশত ব্যক্তিত্বের একটি তালিকা পেশ করেন। বই খানির নাম— **The 100 A Ranking of the most influencial persons in History.** এই একশ জনের মধে সর্ব প্রথম যার নাম লেখ হয়েছে তিনি হযরত মুহাম্মদ (দঃ)।

মি. হার্ট তাকে সকল কালের মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলে স্বীকৃতি দিয়ে কুরআনের বানীকেই সত্য বলে স্বীকার করলেন মাত্র। খ্রীষ্টীয় পনের শতকের ফারসী কবি মোল্লা আবদুর রহমান জামীও বলেছিলেন—

'বাদ আজ খুদা বোজার্গ তুয়ী
কিস্‌সা মোখতাসার ॥"

অর্থাৎ সংক্ষেপে বলতে গেলে খোদাতাআলার পরেই তোমার স্থান।

—০—

★ আত্মার অভাব মুক্তিই হচ্ছে, প্রকৃত অভাব মুক্তি (বুখারী)

এলমে দ্বীন হাসিলের গুরুত্ব

ওবায়দুল হক মিয়া
শিক্ষক (বিষয় ভিত্তিক)

বিশ্ব সভ্যতায় মানুষকে যে জ্ঞান দান করে, সত্যিকার আসন যার মাধ্যমে মানুষ লাভ করে প্রকৃত সত্যের পরিচয় দুনিয়ার আঁকাবাঁকা ও কন্টকাকীর্ণ পথ থেকে সে লাভ করতে পারে সরল সঠিক পন্থা, সে জ্ঞান লাভের উপরই নির্ভর করে মানব জাতির ব্যক্তিগত সামাজিক ও আন্তর্জাতিক জীবনের সফলতা এমন কি বিশ্বের স্থিতি ও পরিবৃদ্ধি। সে জ্ঞান এ পৃথিবীতে মহানবী (সঃ) এর আবির্ভাবের মাধ্যমে প্রজ্জ্বলিত হল। সর্ব যুগের শ্রেষ্ট গ্রন্থ আল কুরানের বাণী, মহানবী (সঃ) এর বাণী ও জীবন চরিত প্রকৃত পক্ষে আমাদের উভয় জাহানের সুখ-সমৃদ্ধির চাবিকাঠি— এটাই হল আল্লাহ প্রদত্ত এলেম বা জ্ঞান। আমরা এ এলেমে দ্বীন হাসিলের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা নিয়ে আলোচনা করছি।

হাদীস শরীফের একটি ঘটনা উল্লেখ করা হল, একদা নবীজী হযরত জিবরাইল (আঃ সাঃ) কে জিজ্ঞেস করলেন হে জিবরাইল আমার উম্মতের জন্য কোন আমল সর্বোত্তম। তিনি বললেন ঃ এলম বা জ্ঞান সাধনা। আমি বললাম, এর পর কি? তিনি বললেন, আলেমদের প্রতি দৃষ্টিপাত করা। এর পর কি? তিনি বললেন আলেমদের জিয়ারত লাভ করা। এর পর প্রিয় নবী (সঃ) বললেন ঃ যে ব্যক্তি এলম হাসিল করবে নিজের জন্য এবং মুসলমানদের সংশোধনের জন্য আর তাতে দুনিয়ার কোন প্রকার উদ্দেশ্য থাকবে না আমি তার জন্য জান্নাতের দায়িত্ব ভার গ্রহণ করব।

অপর একটি হাদীসে উল্লেখ আছে যে কিয়ামতের দিন আল্লাহ পাকের মহান দরবারে এক ব্যক্তিকে হাজির করা হবে, যার পাপরাশি পুন্য থেকে বেশী হবে তাই তাকে দোজখে নিক্ষেপ করার আদেশ দেয়া হবে। অতঃপর আল্লাহ পাক (দয়া পরবশতঃ) হযরত জিবরাইলকে বলবেন ঃ হে জিবরাইল তুমি এ বান্দাহকে জিজ্ঞেস কর যে, সে কোন আলেমের মজলিসে বসেছিল কি না? তা হলে তাঁকে আলেমের সুপারিশে ক্ষমা করা হবে। উক্ত জাহান্নামী ব্যক্তিকে এই প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলে সে উত্তর দিবে যে সে কোন আলেমের মজলিশে বসেনি। তখন হযরত জিবরাইল (আঃ) আরজ করবেন ঃ হে আল্লাহ! তুমি তোমার বান্দাদের সম্বন্ধে ভাল ভাবেই অবগত আছ। আল্লাহ পাক পুনরায় হজরত জিবরাইলকে বলবেন ঃ যাও তাকে জিজ্ঞেস কর সে কোন আলেমের সাথে ভালবাসা রেখেছিল কি না? উক্ত জাহান্নামী বান্দাহ বলবে যে সে কোন আলেমকে ভাল বাসে নাই। তারপর আবার তাকে প্রশ্ন করা হবে যে কোন আলেমের সাথে একই দস্তরখানে বসে আহার গ্রহণ করেছে কি না? এর জবাবেও উক্ত ব্যক্তি না করবে।

পুনরায় আল্লাহপাক হযরত জিবরাইলকে বলবেন ঃ তাকে জিজ্ঞেস কর সে কি কখনো এমন ঘরে বাস করতো যে ঘরে কোন আলেম বাস করত? এবার ও সে বলবে যে তার এমন সুযোগ হয়

নাই। এরপর তাকে পুনরায় জিজ্ঞেস করা হবে, তুমি কি আলেমের নামের সাথে মিল করে নিজের পুত্রের নাম রেখেছ? এ অবস্থা হলেও আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করে দিবেন। এ ব্যাপারেও লোকটি বলবে যে সে কোন আলেমের নামের সাথে মিল করে তার সন্তানদের নাম রাখে নাই। ষষ্ট পর্যায়ে ও শেষ বারের মত আল্লাহপাক হযরত জিবরাইলকে (আঃ) আদেশ করবেন যাও তাকে জিজ্ঞেস কর সে কি এমন কোন ব্যক্তিকে ভাল বাসত, যে কোন আলেমকে ভালবেসেছে? তখন উক্ত ব্যক্তি বলবে হা, আমি তা করেছি। তখন আল্লাহ বলবেন ঃ যাও জিবরাইল, তাকে হাত ধরে বেহেশতে পৌছে দাও। কেননা সে দুনিয়াতে এমন লোককে ভাল বাসত, যারা আলেমকে ভাল বাসত। হাদীসের উক্ত বর্ণনা দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হল যে, একজন এলমে দ্বীনের ধারক ও বাহকের মূল্য আল্লাহর কাছে কতটুকু সম্মানিত। সমাজের সর্বস্তরের লোকজন ইলমে দ্বীনের বাহক তথা আলেম সমাজের মূল্য না দিলেও বা কম দিলে তাতে কিছু আসে না; কারণ সমস্ত জ্ঞানের উৎস ও উৎপত্তি আল্লাহপাকের পক্ষ হ'তে তিনি অবশ্য আলেম সমাজকে মূল্য দিবেন।

আমরা এ প্রসঙ্গে এলমে দ্বীন হাসিল সম্বন্ধে মহানবী (সঃ) এর প্রখ্যাত সাহাবী (সঙ্গী) হযরত মায়াজ বিন জাবালের সুচিন্তিত ও সর্বজন স্বীকৃত অভিমত পাঠক সমাজে পেশ করলাম ঃ— যাতে সকলেই উপকৃত হতে পারি। তিনি বলেন ঃ এলম হাসিল কর, বিদ্যা শিক্ষা কর, আর এলেমের সাধনায় ব্রতী হও। কেননা— ১) এ জ্ঞান হলো আল্লাহ পাককে ভয় করা ২) আর জ্ঞানের তালাস হলো আল্লাহর ইবাদত ৩) জ্ঞানের আলোচনা হলো তাছবীহ পড়ার মত সমতুল্য সওয়াব ৪) জ্ঞান সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করা হল জিহাদ করার মত সওয়াব ৫) জাহেল লোককে এলেম শিখানো হচ্ছে দান সদকা করার মত নেকী ৬) আর জ্ঞান যোগ্য ব্যক্তির নিকট পৌছান অর্থ হল আল্লাহর নৈকট্য লাভ করা ৭) ইহা হালাল হারামের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টিকারী ৮) ইহা বেহেশত বাসীর জন্য হলো আলো ৯) যেখানে ভয়ভীতির সঞ্চার হয়, সেখানে এ এলেমই মনের শান্তি ১০) বিদেশে ভ্রমণে এ জ্ঞানই সঙ্গের সাথী হয়, ১১) নির্জন অবস্থায় জ্ঞান কথা বলে, ১২) লাভ ক্ষতির জন্য এটা দলিল ১৩) দুশমনের বিরুদ্ধে বাঁচার জন্য ইহা হাতিয়ার স্বরূপ ১৪) বুজর্গ ব্যক্তিদের ইহা দ্বীনদারী ১৫) আর বন্ধু মহলে জ্ঞান বা এলেম হ'ল সৌন্দর্য, ১৬) এ জ্ঞানের উসিলায় আল্লাহপাক একটা জাতিকে, উন্নতি, অগ্রগতি, এবং সমৃদ্ধি দান করেন ১৭) এর মাধ্যমে একটা জাতিকে কল্যাণ ও মঙ্গল লাভে হুমাম নিযুক্ত করেন ১৮) এর মাধ্যমে একটা জাতিকে অনুকরন করা হয়, এবং তাদের মতামতের উপর নির্ভর করা হয়; ১৯) এর মাধ্যমে লোকের নিকট থেকে বরকত হাসিল করা হয় ২০) এর জন্য ফেরেশতারা মানুষের সাথে বন্ধুত্ব স্হাপনে আগ্রহী হয় ২১) এলেম হাসিলের জন্য আলেমকে ফেরেশতারা স্বীয় পাখা দ্বারা স্পর্শ করেন ২২) এলেমের জন্য আলেমের পক্ষে দুনিয়ার সব কিছু মাগফিরাত কামনা করে ২৩) সমুদ্রের মাছ পর্যন্ত আলেমের জন্য দোয়া করে ২৪) এমন কি যাবতীয় কীট পতঙ্গ জীব জন্তু পর্যন্ত আলেমের পক্ষ হয়ে আল্লাহ পাকের নিকট মাগফিরাত কামনা করে ২৫) ইল্‌ম হ'ল মানব জীবনের প্রাণ-শক্তির বাহক ও উৎস

আঁধারের আলো স্বরূপ ২৬) এলেমের মাধ্যমে উত্তম ব্যক্তিদের মর্যাদা লাভ করা সম্ভব ২৭) দুনিয়া-আখেরাতে উচ্চ মর্যাদা অর্জিত হয় ২৮) জ্ঞান অর্জনে চিন্তা-গবেষণা ও অধ্যয়ন করা রোজা রাখার সমান সওয়াব ২৯) জ্ঞান নিজে শিক্ষা করা আর অপরকে শিক্ষা দেওয়া তাহাজ্জুদ নামাজের সমান মর্যাদা রাখে (৩০) এর মাধ্যমে একে অপরকে সত্যিকারের ভাবে সাহায্য করা হয় ৩১) এলেমের মাধ্যমে হালাল হারাম ন্যায় অন্যায় পার্থক্য করা সম্ভব ৩২) এলেম হলো মানব জীবনে চলার পথে ইমাম (পথ প্রদর্শক) আর আমল হলো তার মোকতাদী (বা অনুসারী) ৩৩) নেককার লোকদের জন্য এলেম এলহামের মত কাজ করে। আর হতভাগ্য লোকদেরকে এলেম থেকে বঞ্চিত করা হয়।

ইলমের দ্বীনের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তার উপর বহু তাগীদ করা হয়েছে; এমন কি মহানবী (সঃ) এলেম তলব করা ফরজ বলে ঘোষণা করেছেন। দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত এলম শিখার সময় সীমা নির্ধারন করেছেন মহানবী (সঃ)। এ প্রসঙ্গে ইহা উল্লেখ করা অতি প্রয়োজন যে ইলমে দ্বীন হাসিল করার উদ্দেশ্য হবে একমাত্র আল্লাহপাকের সন্তুষ্টি লাভ করা এবং পরিপূর্ন ভাবে মহানবী (সঃ) এর দেখানো এবং সেখানো পথে অর্জিত এলেমের উপর আমল করা। যার নিকট এলমে দ্বীনের শিক্ষা ও আমল নাই তার জীবন বৃথা, তার জীবনে পেরেশানি, অস্থিরতা, দুঃখ, দৈন্য ও অবমাননা, ইত্যাদি নিত্য সঙ্গী হবে।

) ঃ (

★ পবিত্রতা ঈমানের অর্ধাংশ। (মুসলিম)

আন্তর্জাতিক ফুটবলে বাংলাদেশ

মোঃ কবির উদ্দিন সরকার (কনক)
দশম শ্রেণী, বিজ্ঞান শাখা

বাংলাদেশ। একটি নাম। একটি রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর নব স্বাধীন একটি রাষ্ট্র। ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর এদেশ স্বাধীনতা লাভ করে। বিগত বছর গুলোতে এদেশের উপর দিয়ে বয়ে যায় বন্যা, জলোচ্ছাস, টর্নেডো, খরা প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগ। তবু এই উন্নয়নকামি দেশের উন্নয়নে কোনরূপ বাধার সৃষ্টি হয়নি। দেশের সার্বিক উন্নতির সাথে এদেশের খেলাধুলারও ব্যাপক উন্নতি হয়েছে। এদেশের ক্রিড়া কর্মকাণ্ড সাধারণত রাজধানী শহর ঢাকাকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়।

বাংলাদেশ এশিয়া ক্রীড়াঙ্গনে একটি পরিচিতি নাম। এই পরিচিতির মূলেই রয়েছে ফুটবল। আন্তর্জাতিক ফুটবল ফেডারেশন বা ফিফা ১৯৮৯ (ইং) সনের র‍্যাটিং এ বাংলাদেশকে দক্ষিণ এশিয়া বা সার্ক ভূক্ত দেশগুলোর মধ্যে শ্রেষ্ঠ ফুটবল দল হিসাবে ঘোষণা করে। স্বাধীনতার পর ১৯৭৩ সালে মালয়েশিয়ার ১৯ তম মারদেকা ফুটবল প্রতিযোগীতায় অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক ফুটবল প্রতিযোগীতায় প্রবেশ করে। এরপর থেকে বিভিন্ন প্রতিযোগীতায় অংশগ্রহণের জন্য বাংলাদেশ দেশের বাইরে যায় এবং বিভিন্ন দেশও বাংলাদেশে খেলতে আসে।

১৯৭৩ সাল হতে ১৯৮৯ (সেপ্টেম্বর) সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ ৩টি এশিয়াড, ২টি বিশ্বকাপ বাছাই ৩টি এশিয়া কাপ, ৩টি সাফ গেমস ও বেশ কয়েকবার এশিয়া যুব ফুটবলে এবং দক্ষিণ কোরিয়া মালয়েশিয়া, থাইল্যাণ্ড ও পাকিস্তানের প্রতিযোগীতায় অংশ গ্রহণ করে। এছাড়া ঢাকায় প্রেসিডেন্ট গোল্ড কাপেও বাংলাদেশ নিয়মিত অংশ গ্রহণ করে। ১৯৮৪ সালে কাঠমুণ্ডুতে অনুষ্ঠিত প্রথম ও ১৯৮৫ সালে ঢাকায় অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় সাফ গেমসে বাংলাদেশ ফুটবলে রানার্সআপ হয়। পাকিস্তানের প্রথম কায়েদে আজম ট্রফি ও ১৯৮১ সনে ঢাকায় অনুষ্ঠিত প্রেসিডেন্ট গোল্ডকাপেও বাংলাদেশ রানার্স আপ হয়েছিল। এই বছর (১৯৮৯) ষষ্ঠ প্রেসিডেন্ট গোল্ডকাপে চ্যাম্পিয়ান হয়ে বাংলাদেশ প্রথম বারের মত ফুটবলের সর্বোচ্চ সম্মান লাভ করে। এ ছাড়া অন্যান্য টুর্নামেন্টে বাংলাদেশের স্থান সব সময় ছিল নীচের দিকে।

নিম্নে আন্তর্জাতিক বিভিন্ন প্রতিযোগীতায় বাংলাদেশের ফলাফল দেয়া হলো ঃ

এক নজরে আন্তর্জাতিক ফুটবলে বাংলাদেশ

প্রতিযোগীতার নাম	খেলা	জয়	ড্র	পরাজয়	গোল পক্ষে	গোল বিপক্ষে	কতবার অংশ গ্রহণ করে
এশিয়াড	০৯	০২	০০	০৭	০৩	২০	৩ বার
বিশ্বকাপ বাছাই	১২	০৩	০০	০৯	১০	২০	২ ,,
এশিয়া কাপ ফুটবল	১৮	০২	০৫	১১	১৬	৪৭	৩ ,,
সাফ গেমস ফুটবল	১০	০৫	০১	০৪	৩০	১৫	৩ ,,
এশিয়ান যুব ফুটবল	২৬	০৫	০৬	১৫	২৩	৪৪	৭ ,,
প্রেসিডেন্ট গোল্ড কাপ ঢাকা	৪৮	১৩	১৮	১৭	৫৩	৬৪	৬ ,,
পাকিস্তান প্রেসিডেন্ট গোল্ডকাপ	০৩	০১	০১	০১	০৩	০৫	১ ,,
প্রেসিডেন্ট গোল্ডকাপ (সিউল)	০৪	০২	০০	০২	০৭	১৬	১ ,,
মারদেকা ফুটবল	১৭	০১	০৬	১০	১১	৪৮	৩ ,,
কায়েদে আজম ফুটবল	১০	০৩	০৩	০৪	১০	১৬	২ ,,
কিংস কাপ (ব্যাংকক)	০২	০০	০০	০২	০০	০৮	১ ,,
মোট ঃ—	১৫৯	৩৭	৪০	৮৩	১৬৬	২৯৭	

তথ্য সংগ্রহ ঃ ইত্তেফাক ১৬ই আশ্বিন ১৩৯৬ বাংলা।

★ প্রতিবছর দুটি করিয়া দল অংশ গ্রহণ করে।

—০—

০ নামাজ ধর্মের স্তম্ভ। (বায়হাকী)

হ্যালির ধূমকেতু

সংগ্রহে
গোলাম দাস্তেগীর
৮ম শ্রেণী, ক শাখা

গত বাইশ শতাব্দী ধরে সারা পৃথিবীর বুকে রহস্যময় আলোড়ন সৃষ্টিকারী বিস্ময়কর জ্যোতিস্ক বিখ্যাত ধূমকেতু "হ্যালি" সৌরপরিক্রমনে ৭৫ বছর পর-পর ফিরে আসছে পৃথিবীর কাছাকাছি এলাকায়। ১৯৮৬ সালেও সে এসেছিল খালি চোখে দেখার মত স্থানে। ওকে চোখে দেখবার সৌভাগ্য এক জীবনে একবারই হয়ে থাকে। একবার সুযোগ ফসকালে দ্বিতীয় বার সম্ভব হয় না। কারণ, আবার ফিরে আসতে সময় লাগবে ৭৫/৭৬ বছর। তত দিন বেঁচে থাকার সম্ভাবনা খুবই কম। যে বিজ্ঞানী একে চিহ্নিত করেছিলেন সে বিজ্ঞানীও তার ভবিষ্যত বাণীর সত্যতার প্রমাণ দেবার জন্য বেঁচে থাকতে পারেনি পরের বার। হ্যালিকে স্বাগত জানানের জন্য প্রায় ,৭শ' জ্যোতি বিজ্ঞানী তাদের টেলিস্কোপ নিয়ে টোকিওর উত্তরে একটি উচ্চ স্থানে জমায়েত হয়েছিলেন। কিন্তু তারা তখন ২৯ কোটি ৯২ লক্ষ ৭৪ হাজার কিঃ মিটার দূরে অবস্থানরত অতিথিকে দেখতে পাননি। তবে ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল গবেষক প্রায় ১৬০ কোটি কিঃ মিঃ এর মধ্যে চলে আসার পর একটি শক্তিশালী টেলিস্কোপ দিয়ে দেখেন। তারা দেখতে পান একটি নিস্প্রভ আলো এগিয়ে আসছে। পৃথিবী আর সূর্যের সাথে নিকটতম সাক্ষাতের জন্য।

ধূমকেতুটির সম্পর্কে সর্ব প্রথম তথ্য সংগ্রহ করেন চীনা জ্যোতির্বিদরা খ্রীষ্টপূর্ব ২৪০ অব্দে। সত্যিকার অর্থে মহাকাশের রহস্যময় জ্যোতিস্ক ধূমকেতু কিন্তু ভবঘুরে বাসিন্দা নয়। ওদের চাল-চলনে রয়েছে নির্দিষ্ট নিয়ম-কানুন। তাদেরও রয়েছে নির্দিষ্ট কক্ষ পথ। ব্যাপারটা প্রথমে অনুমান করেন, বৃটেনের বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ এড্‌মণ্ড হ্যালি (১৬৫৬—১৭৪২)। ১৬৮২ খ্রীষ্টাব্দে হঠাৎ করে এসে হাজির হয় একটি অতিকায় ধূমকেতু। হ্যালির বয়স তখন মাত্র ২৬ বৎসর। তিনি নিউটনের মধ্যাকর্ষণ শক্তির যে তত্ত্ব তা দিয়ে ধূমকেতুটির গতিবিধি পরীক্ষা করে দেখেন। পরীক্ষার পর নিশ্চিত হন ধূমকেতুরা নিউটনের মধ্যাকর্ষণ তত্ত্ব মেনে চলে। এর সাথে আরো মিলিয়ে দেখ-লেন ১৬০৭, ১৫৩১ এবং ১৪৫৬ সালে আসা ধূমকেতুদের উপর সংগৃহীত তথ্যগুলি। দেখেশুনে তার মনে এ বিশ্বাস জাগে আগের ধূমকেতুগুলো আর ১৬৮২ সালের আসা ধূমকেতুটির বিশেষ মিল আছে। তিনি আরো লক্ষ্য করেন, পূর্বে ধূমকেতুগুলো আকাশের যে জায়গায় দেখা গিয়েছিল ১৬৮২ সালেরটিও অর্থাৎ তাঁর সময়টিও যেটি তিনি গবেষনা করেন, ঠিক সে জায়গায় দেখা গিয়েছে। এ সব কিছুর প্রেক্ষাপটে বিজ্ঞানী বুঝতে পারেন ওগুলো সব একই ধূমকেতু। একটা নির্দিষ্ট কক্ষপথ বেয়ে ৭৫/৭৬ বছর পর-পর ঘুরে ঘুরে ফিরে আসে। ভবিষৎদ্বানী করে "ধূমকেতুটি আবার ফিরে আসবে ৭৫/৭৬ বছর পর ১৭৫৭/১৭৫৮ সালে।

৭৫ বছর যখন ধূমকেতুটির আবার ফিরে আসার সময় হল, তখন বিজ্ঞানীরা অঙ্ক কষে বল্লেন এবার বৃহস্পতি আর শনির টানে পড়ে তার আসতে এক-আধ বছর দেরি হবে। যদি হ্যালির ভবিষৎবানী ঠিক হয় তাহলে ১৭৫৯ সালের দিকে আসবে। কিন্তু বিজ্ঞানীদের হিসাবকে তুড়িমেরে উড়িয়ে দিয়ে সবাইকে হতবাক করে ১৭৫৮-র পঁচিশে ডিসেম্বর ক্রিস্টমাস ডে'তেই এসে হাজির হয় মহাশূন্যের বিস্ময় দীর্ঘ পুচ্ছ ধারী ধূমকেতুটি।

তাহারা বুঝতে পারলেন 'হ্যালির ধূমকেতুর' ভবিষৎবাণী ছিল নির্ভুল এবং এ নির্ভুল ভবিষৎবানী টুকুই প্রমাণ দিল যে ধূমকেতুরা মহাশূন্যের ভবঘুরে বাসিন্দা নয়। তাদেরও রয়েছে নিদিষ্ট চালচলনের পথ ও সময়; যেমন রয়েছে আমাদের সৌরজগতের অন্যান্য গ্রহ উপগ্রহদের। বিজ্ঞানী হ্যালির জয়জয়কার পড়ে গেল বিশ্বময়। কিন্তু দুঃখের বিষয় প্রাকৃতিক কারণেই তিনি বেঁচে ছিলেন না তার কৃতিত্ব দেখার জন্য। এ কৃতিত্ব কিন্তু একমাত্র হ্যালির একার পাওনা। বিজ্ঞানীরা সেদিকটাকে লক্ষ্য রেখেই ধূমকেতুটির নাম করন করেন, হ্যালি।

গত ১৯১০ সালে তাকে পৃথিবী থেকে দেখা গিয়েছিল সেবার তার লেজ বা মনোমুগ্ধকর আলোক বর্ণালীময় পুচ্ছটি ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়েছিল মহাশূন্যর ৮ কোটি ৪ লক্ষ ৫০ হাজার কিঃ মিঃ জায়গা জুড়ে। বিজ্ঞানীরা এর দেহের ওজন অনুমান করেছেন ১১ বিলিয়ন টন।

ধূমকেতুদের দেহের বেশির ভাগই গ্যাসীয়। নিরেট বা কঠিন আকারে খুব কম হয়। সারা দেহের মধ্যে নিউক্লিয়াস বা কেন্দ্র হল কঠিন, এটুকুই মুল। নিউক্লিয়াসের একটা ছোট হিসাব নিম্নে দেওয়া হল।

ব্যাস ৩০ কিঃ মিঃ পরিধি ২৮২৬৯ কিঃ মিঃ আয়তন প্রায় ১৪ হাজার ১শত ৩৪ দশমিক ৫ কিঃমিঃ

কয়েক শতাব্দী ধরে আলোড়ন সৃষ্টিকারী ধূমকেতুটি নিয়ে ১৯৮৬ সালে বিশ্বে বেশ হৈ চৈ হয়ে গেল। হয়েছে বিস্তর গবেষনা। ১৯৮৬ সালের আগে এই ধূমকেতুটি নিয়ে এত বেশি পরীক্ষা নিরীক্ষা হয়নি।

—০—

০ রোজা (আত্মরক্ষার) ঢাল স্বরুপ। (বুখারী মুসলিম)

শিক্ষকের প্রতি শ্রদ্ধা

আ, ন, ম, আব্দুল মান্নান
শিক্ষক (বিষয় ভিত্তিক)

আল্লাহ পাক সৃষ্টিকুলের সৃষ্টিকর্তা। মানুষ হচ্ছে সৃষ্টির সেরা জীব, আল্লাহর প্রতিনি, আদি পিতা হযরত আদম (আঃ) কে সৃষ্টি করার পর আল্লাহ তাঁকে যাবতীয় বস্তুর ইলম শিক্ষা দেন। আদম (আঃ) খোদা প্রদত্ত জ্ঞানের গৌরবে ফেরেশতাকুলের সামনে পেশকৃত বস্তু সামগ্রীর নামধাম ও প্রয়োগ প্রণালী ব্যক্ত করে তাঁদের উস্তাদ রূপে স্বীকৃতি পেলেন। সেই প্রেক্ষিতে আল্লাহ পাক ফেরেশতাগণকে উস্তাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য 'সেজদায়ে তাজিম' (সম্মান সূচক সিজদা) করার নির্দেশ দিলেন। উপস্থিত সকলেই তাকে সেজদা করেন। বাকী রলো শুধু ,ইবলিস'। সে সৃষ্টিকর্তার নির্দেশ অমান্য করে; সাথে সাথে উস্তাদ আদম (আঃ) এর ও অবজ্ঞা করে। তাই ইবলিস চিরকাল খোদার লা'নতের (অভিসম্পাতের) জিঞ্জিরে আবদ্ধ।

যুগে যুগে আল্লাহ অগনিত নবীরাসুলদের স্বীয় কুদরতে যুগ উপযোগী শিক্ষা দান করে মানুষকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য প্রেরণ করলেন তাঁর হলেন পূত ও পবিত্র চরিত্রের অধিকারী মহান শিক্ষা দাতা। মানবিক গুনাবলীর অধিকারী ছিলেন তাঁরা। প্রত্যেক নবীর প্রতিই তাঁদের শিষ্যবর্গের ছিল অগাধ শ্রদ্ধাবোধ। যার ফলে তাঁরা ইহকালে ও পরকালে সফল কাম।

আল্লাহ পাক কুরআন মজীদে তাঁর ইবাদত বন্দীগী করার নির্দেশ দেওয়ার পরপরই ঘোষনা করে বলেছেন—তোমরা তোমাদের মাতাপিতার প্রতি সদ্ব্যবহার করো, তাঁদের মান্য করো।" মাতা পিতার পর যাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা প্রতিটি মানব কুলের অপরিহার্য কর্তব্য তাঁরা হলেন শিক্ষা গুরু, শিক্ষক সম্প্রদায়।

পিতা মাতার কাছে আমরা দায়ী· আমাদের জীবন লাভের জন্য, আর জীবন তরী কি ভাবে চালিয়ে যাব, কি ভাবে জীবন যাপন করলে প্রকৃত মনুষত্বের বিকাশ লাভ হবে ইত্যাদি শিক্ষা লাভ করি শিক্ষকের কাছে। সুতরাং অতিশয় শ্রদ্ধার পাত্র। পিতা মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করা ও তাঁদের মান্য করা সম্পর্কে কুরআন-হাদিসে উপদেশ দেওয়া হয়েছে। আর যিনি শিক্ষক, যিনি আমাদের মন ও মানসিকতা গঠনে, বুদ্ধি বিকাশে, জ্ঞানের উন্মেষে সর্বাত্মক সহায়তা করেছেন তার প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা নিবেদন করা মা-বাবার চাইতে কোন অংশে কম নহে। দিক বিজয়ী

আলেকজাণ্ডার তাঁর শিক্ষাগুরু এরিষ্টটল সম্পর্কে বলেছেন —To my father I owe my life but to Aristotle I owe how to live worthy—পিতার কাছ থেকে আমি আমার জীবন লাভ করেছি সে জন্য ঋনী, আর কি ভাবে আমি জীবন যাপন করবো সে প্রশিক্ষনের জন্য এরিষ্টটলের কাছে ঋনী।

শিক্ষা গুরুর প্রতি সেবা ও তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন মানবতার প্রথম কর্তব্য যথা – ফেরেস্তা-কুল হযরত আদম (আঃ) এর প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের কথা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি।

উস্তাদের পায়ে পানি ঢেলে ধৌত করে দেয়নি বলে বাদশাহ আলমগীর তাঁর ছেলেকে ভৎসনা করেন এবং ছেলেকে উস্তাদের প্রতি যথাযথ ভক্তি শ্রদ্ধা করা শিখেনি বলে উস্তাদের প্রতি কৈফিয়ত তলব করেন।

বিদ্যা মানুষকে বিনয় ও নম্রতা শিক্ষা দেয়। যিনি একটি বর্ণ ও শিক্ষা দিয়েছেন তিনিই শিক্ষা গুরু এদিক দিয়ে চিন্তা করলে বুঝা যায় দুনিয়ার বুকে জীবন যাপনে যাদের সংস্পর্শে এসে মানব সন্তান যা কিছু প্রশিক্ষন প্রাপ্ত হয়েছে, তাঁরা সকলেই শিক্ষাগুরু। সুতরাং মা বাবা, ভাই বোন, পাড়া প্রতিবেশী, গুরুজন সকলের কাছেই আমরা কিছু না কিছু শিখে থাকি। অতএব এদের সকলের সাথেই আমাদের বিনম্র ব্যবহার করা কর্তব্য। তাঁরা সকলেই আমাদের কল্যানকামী ও শুভাকাংখী।

বিদ্যা অর্জনকে যদি আমরা ব্যবসার পন্য মনে করে শিক্ষককে তাঁর প্রচলিত বেতন প্রদান করেই কর্তব্য শেষ হয়ে গিয়েছে বলে ধারণা করি তবে নিতান্তই ভুল হবে। শিক্ষকের প্রতি যদি কৃতজ্ঞতা ও বিনয় বোধ না থাকে তবে সে বিদ্যা অসাড় ও মূল্যহীন।

জগতে যে সকল মনীষী অক্ষয় কীর্তি রেখে গেছেন তাদের সকলেই স্বীয় শিক্ষাগুরুর প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা করেছেন, সেবা যত্ন করেছেন।

মহানবী (দঃ) বলেছেন,—"আমি প্রেরিত হয়েছি শিক্ষক হিসাবে।" তাঁর প্রত্যক্ষ শিষ্যবর্গ সাহাবায়ে কেরাম তাঁর কাছে মানবতার শিক্ষা গ্রহন করে খ্যাতি লাভ করেছেন। অথচ ইস্‌লাম গ্রহণের পূর্বে এবং নবীজীর সংষ্পর্শে আসরা প্রাক্কালে তাদের চরিত্র তেমন ছিল না। আর নবী-জীর শিষ্যত্ব লাভ করে আদর্শ জীবন যাপনে তাঁরা ব্রতী হন। সাহাবায়ে কেরাম শিক্ষা গুরুর জন্য নিজেদের জান মাল উৎসর্গ করতে ও কুণ্ঠা বোধ করেনি। উহুদের যুদ্ধে নবীজীর দান্দান (দাঁত) (দঃ) শহীদ হয়। তাঁকে শত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষা করার উদ্দেশ্য তাঁরা তাঁকে চারি দিক দিয়ে বেষ্টন করে রইলেন। এমনি ভাবে উস্তাদের প্রতি, শিক্ষা গুরুর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের বহুবিধ প্রমাণ রয়েছে।

একবার একজন মহিলা এসে হযরত আলী (রাঃ) এর কাছে বললেন –"বাবা আমার স্বামী আপনার উস্তাদ ছিলেন বলে আমি জানি।" তিনি ইন্তেকাল করেছেন, আমি তাঁরই সহধর্মিনী। আমি এখন বড়ই কষ্টে দিনাতিপাত করছি! আপনার উস্তাদের হক হিসাবে প্রাপ্য প্রদান করলে আমি উপকৃত হবো হযরত আলী (রাঃ) স্মরণ করে দেখলেন একদা কুরআন তেলাওয়াতের সময় একটি হরকত তিনি শোধরিয়ে দিয়েছিলেন তাঁকে। এবারে হযরত আলী (রাঃ) উস্তাদের হক সম্পর্কে নবীজীর কাছে জানতে চাইলেন। নবীজী তাঁকে একটি তীর উপরের দিকে ছুড়তে বললেন এবং তীরটি যতদূর উর্ধে উঠে সেই পরিমাণ সম্পদ প্রদান করতে তাঁকে নির্দেশ দিলেন হযরত আলী (রাঃ) আরজ করে বললেন তাহা আমার পক্ষে সম্ভব নহে। তখন তিনি (নবীজী) বললেন – তাহলে মহিলাকে যা দিয়ে পার খুশি কর এবং বিনম্র ভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। এটাই হলো উস্তাদের হক।"

"দুনিয়ার ধন সম্পদ দিয়ে উস্তাদের হক আদায় করা কাহারও পক্ষে সম্ভব নহে। তাঁদের প্রতি সদ্ব্যবহার করা, কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা এবং তাদের জন্য মাগফেরাত কামনা করা প্রত্যেকেরই অবশ্য কর্তব্য। হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে, আমাদের পিতামাতাকে, আমাদের উস্তাদগণকে তুমি ক্ষমা কর, মাফ কর।"

) ঃ (

★ যাকাত দ্বীন ইসলামের সেতু। (তাবরানী)

কৌতুক নকশা

মোঃ শাহীনুর হাসান
৮ম শ্রেণী শাখা খ, রোল—২

১। শিক্ষক ঃ এই খোকা তোমার তো আগামীকাল অংক পরীক্ষা তাই না।

ছাত্র ঃ স্যার, আমি তো বইয়ের সম্পূর্ণ অংকই করে শেষ করেছি। আমি এখন পারি।

শিক্ষক ঃ বেশ তোমাকে আমি যোগ বিয়োগ বাদে সবই তো করেয়েছি তুমি তো পারবেই।

ছাত্র ঃ পরীক্ষা দিয়ে এসেছে।

শিক্ষক ঃ কি খোকা কেমন পরীক্ষা দিয়েছ।

ছাত্র ঃ স্যার, ভাল কিন্তু দুটো দেইনি।

শিক্ষক ঃ কোন 'দু'টো

ছাত্র ঃ স্যার যে 'দু'টো যোগ বিয়োগ ছিল।

২। 'দু'টোবন্ধু ছিল অত্যন্ত চালাক তাই ১ জন অন্যকে ঠকানোর জন্য

১ম বন্ধু ঃ— আমি না ১ মাস আগে এই দালানটি—দোতলা দেখেছি। এখন দেখছি আটতলা।

২য় বন্ধু ঃ— আমি না ঐ দালানটিকে ১ সপ্তাহ আগে তেতলা দেখেছি, আর এখন দেখেছি নয় তালা

১ম বন্ধু আবার ঃ— 'জান' ঐ ট্রেনটি কালকে দেখেছি — ১টি কামড়া আর আজকে দেখছি সবটিই রয়েছে।

২য় বন্ধু ঃ— আমি ঐ গুদাম ঘরটিকে সকালে দেখিনি— কিন্তু এখন দেখছি।

৩। একটি লোক প্রচুর খাবার খেত। তাই সে একদিন ডাক্তারের কাছে গেল।

লোক ঃ ডাক্তার সাহেব আমি এখন বেশী খেতে পারি না।

ডাক্তার সাহেব ঃ তুমি আরো কম খাবার খাবে।

লোক ঃ ডাক্তার সাহেব আমাকে অতি শীঘ্রই আত্ম-হত্যা করতে হবে।

ডাক্তার সাহেব ঃ আমি যা বললাম তাই করবে।

লোকটি ঃ ভীষন চটা, চারতলার উপরে ওঠে সে আল্লাহ র কাছে প্রার্থনা করে লাফ দিল। দিয়ে ডাক্তার সাহেবকে জিজ্ঞেস করছে। ডাক্তার সাহেব আমি কি বেঁচে আছি।

ডাক্তার সাহেব ঃ হ্যাঁ তুমি বেঁচে আছো ওরা বেঁচে নেই।

লোকটি ঃ কারা ?

ডাক্তার সাহেব ঃ যাদের উপরে তুমি পড়েছিলে।

৪। সাহেব ঃ এই রহিম আমার কেস নিয়ে আসত।
রহিম ঃ সাহেব আমি তো কোন কেশ দেখেনি।
সাহেব : মানে, তুমি কি ঘরে থাকো না।
রহিম : সাহেব ঘরে আমি আর আপামনি থাকি। আর কেউ তো থাকে না।
সাহেব : তোমরা কি বলতে পার না কেস কোথায়।
রহিম : সাহেব আমি গতকাল আপনার পকেট থেকে মাত্র দুটো টাকা নিয়েছি আমার নামে আবার কেশ।
সাহেব : আরে বোকা ঐ কেস নয় আমার জুতো।

৫। দুই বন্ধু চীন দেশে ঘুরতে গিয়েছে।
১ম বন্ধু ঃ আমার খুব খিদে পেয়েছে।
২য় বন্ধু ঃ চল আমরা রেস্টুরেন্টে যাই।
১ম বন্ধু ২য় বন্ধুকে ঃ আমরা তো চীনা ভাষা জানি না।
২য় বন্ধু : চল আমরা ইশারায় চালিয়ে দেব।
১ম বন্ধু : রেস্টুরেন্টে তো এলাম এবার কি ভাবে ডাকবো।
২য় বন্ধু : হুস হুস করে বেয়ারাকে ডাকছে।
বেয়ারা ঃ চুং, পুং, ডুং
২য় বন্ধু ঃ চিকেন রোস্ট, চিকেন ফ্রাই, ভেজিটেবল সুপ।
বেয়ারা : তাদের দিয়ে গেল।
১ম বন্ধু ঃ আরে এ'টাতো হাসের মাংস।
২য় বন্ধু ঃ না এটা মুরগীর মাংস। তাদের মধ্যে তুমল ঝগড়া।
২য় বন্ধু ঃ এসো ঝগড়া না করে আমরা বেয়ারাকে ডাকি সেই বলে দেবে এটা কিসের মাংস।
১ম বন্ধু মাংস দেখিয়ে বেয়ারাকে বলছে কক, কক, কক।
বেয়ারা ঃ No.
১ম বন্ধু : পেক, পেক, পেক, বেয়ারা : No.
বেয়ারা ঃ ভেউ, ভেউ, ভেউ।
১ম এবং ২য় বন্ধু : বুঝতে পারলো যে এটা কুকুরের মাংস।

—০—

★ পানি যেমন ময়লা ধুয়ে সাফ করে, তেমনি হজ্জ সকল গুনাহ ধুয়ে মুছে সাফ করে দেয়। (তাবরাণী)

কৌতুক

মাসুদ পারভেজ
নবম শ্রেণী, খ শাখা

১

স্যার ঃ পিন্টু পড়া শিখেছ ?

পিন্টু ঃ হ্যা স্যার

স্যার ঃ বলতো, পৃথিবীর আকার কেমন ?

পিন্টু ঃ গোলাকার।

স্যার ঃ তা, একটি প্রমাণ দাও তো।

পিন্টু ঃ বেশ জোরালো প্রমাণ রয়েছে স্যার, প্রথম সাপ্তাহিক পরীক্ষায় আমি লিখেছিলাম পৃথিবী চ্যাপ্টা, তাতে আপনি কাটা দিয়েছিলেন।

দ্বিতীয়বার লিখলাম লম্বা তাও কাটলেন।

তৃতীয়বার লিখলাম চারকোনা তাও কাটলেন।

চতুর্থবার লিখলাম ত্রিকোনা তাও কাটলেন। তাহলে গোলাকার ছাড়া পৃথিবী আর কি রকম হতে পারে আপনিই বলুন স্যার।

২

১ম ব্যক্তি ঃ আপনার দোকানের ম্যানেজার কোথায়।

২য় ব্যক্তি ঃ কেন ?

১ম ব্যক্তি ঃ কি মিষ্টি বানান আপনারা ? মুখেও দেয়া যায় না। আচ্ছা এবার বলুন ম্যানেজার কোথায় ?

২য় ব্যক্তি ঃ পাশের দোকানে গিয়েছেন মিষ্টি খেতে।

৩

১ম ছাত্র ঃ আমার ভাই একজন বিখ্যাত ডুবুরি, পানির নিচে ৯ ঘন্টা ডুবে ছিল।

২য় ছাত্র ঃ আচ্ছা ডুবুরি কি খায় না পড়ে।

১ম ছাত্র ঃ দুর বোকা, ডুবুরি হল যে পানিতে ডুবদিয়ে জিনিষ পত্র খোজে। বা ডুবদিয়ে অনেক ক্ষণ থাকতে পারে।

২য় ছাত্র ঃ ও, বুঝেছি। তা'হলে আমার ভাই পৃথিবীর বিখ্যাত ডুবুরি।

১ম ছাত্র ঃ কেন।

২য় ছাত্র ঃ আজ ৯ মাস হল আমার ভাই ডুব দিয়েছে মেঘনা নদীতে।

—০—

★ রক্তের সম্পর্ক ছিন্নকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না (বুখারী মুসলিম)

স্মৃতি চারণ

মোঃ আবুল কালাম আজাদ
৮ম শ্রেণী, শাখা ক

মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলার গ্রাম থেকে যুদ্ধে গিয়েছিল কত দেশ প্রেমিক যুবকরা। তাদের সাথে যুদ্ধে গিয়েছিল খোকাও। যুদ্ধে যাওয়ার সময় ঘরে রেখে গিয়েছে তার মাকে। মা ঘরে বসে সর্বক্ষণ কাঁদে আর চিন্তা করে, এখন খোকা কেমন আছে? কি খাচ্ছে? কবে যুদ্ধ শেষ করে বাড়ী ফিরে আসবে? নাকি বাড়ী ফিরবে না। এ সব ভাবতে ভাবতে মনকে কিছুতেই স্থির করতে পারে না। খোকা যুদ্ধের মধ্যেও মাঝে মধ্যে চিঠি লিখে। তার খোকা এখন তার কাছে নেই, তাই সে চিঠি বুকে সর্বক্ষণ জড়িয়ে রাখে।

খোকা যুদ্ধে বেশ বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করে চলেছে। একদিন যুদ্ধ করতে করতে হঠাৎ রাজাকারদের হাতে পড়ে গেল। তারা খোকাকে বলল, "বাবা তুমি কেন এত যুদ্ধ করছ? তুমি তো তোমার দেশকে রক্ষা করতে পারবে না।" তখন তাদের উপর সে হুংকার দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে দুটি বুলেট দিয়ে রাজাকারের জীবন শেষ করে দিল।

আরেক দিন খোকা যখন তার বন্ধুদের সাথে যুদ্ধ ক্ষেত্রে ঠিক সেই সময় সে দেখতে পেল তাদের ক্যাম্পের পিছন দিয়ে কয়েকজন পাকিস্তানী সৈন্য যাচ্ছে। তখন একাই তাদের সবাইকে লক্ষ্য করে ষ্টেন গানের গুলি ছুড়লো। গুলির আঘাতে শুধুমাত্র একজন বেঁচে গিয়ে সব গুলো সৈন্য মারা গিয়েছিল। যে একজন বেঁচে গিয়েছিল সেইজন তাদের ক্যাম্পটা চিনে মরার মত শুয়ে রইল। রাত তখন সারে আটটা। অনেক দিন হয়ে গেল মা'র কাছে কোন চিঠি পত্র লেখা হয় না। খোকার যখন চিঠি লিখা লেখা প্রায় শেষ, ঠিক এমন সময় সেই যে সৈন্যটি প্রাণে বেঁচে গিয়েছিল, সেই সৈন্যটি এসে তার বুক বরাবর গুলি মারল। গুলির আঘাতে সে সব কিছু উলট পালট দেখতে লাগল। তখন তার মনে পড়ে গেল তার দুঃখীনী মায়ের কথা। মার কথা মনে পড়তেই সে চিঠি খানিকে পরিপূর্ণ করে তুলল।

যুদ্ধ প্রায় শেষ। গ্রামের সবাই বাড়ী ফিরে এসেছে। শুধু আসেনি তার খোকা। কিছু দিন পর মার কাছে একটি চিঠি এলো। চিঠিটা লিখেছিল তার খোকা মৃত্যুর ঠিক পূর্ব মুহূর্তে। খোকা লিখেছে; "মা-মা-গো, আমি আর তোমার দেশকে রক্ষা করতে পারলাম না। জন্ম ভূমিকে অর্জিত করতে যে কত কষ্ট তা আমি প্রণ দিয়ে প্রমাণ করেছি। মা তুমি দেখো, তোমার অন্য সব ছেলেরা মিলে দেশকে রক্ষা করবেই। মা-গো, ওরা আমাকে কুকুরের মত অত্যাচার করে আমার বুকে গুলি মেরেছে। ওরা আর আমাকে তোমার কোলে ফিরে যেতে দিল না। বল মা, আমি কি কোন পাপ করেছি? মা-গো যদি আমার কথা মনে পড়ে তা হলে তুমি এই চিঠিটা পড়ে তোমার সন্তান হারা দুঃখ ভুলে যেয়ো।" মা তখন চিঠি পড়ে আর চিঠির প্রত্যেকটি লাইন তারা অশ্রু ভেজা চোখের পানিতে মুছে দেয় আর বলে, "খোকা, খোকারে, তুই কোথায়?"

— × —

★ ঘুষদাতা ও গ্রহীতা উভয়ই দোযখের আগুনে জ্বলবে (তাবরাণী)

মুজাদ্দিদে আলফেসানী

মোঃ মোসলেম উদ্দিন খান
শিক্ষক (হেড মাওলানা)

মুজাদ্দিদ আরবী শব্দ। অর্থ সংস্কারক। আলফেসানী অর্থ দ্বিতীয় সহস্র। পুরো নামটির অর্থ হলো দ্বিতীয় সহস্রের সংস্কারক। তাঁর পুরো নাম আবুল বারাকাত বদরুদ্দিন শেখ আহ্‌মাদ সিরহিন্দ। আল্লাহ পাক যুগে যুগে নবী ও রাসূল পাঠিয়ে মানব জাতিকে ভ্রান্ত মতবাদ তথা কুসংস্কার থেকে বিরত রেখেছেন। যেহেতু মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর পরে আর কোন নবী-রাসূল আসবে না। তাই আল্লাহ পাক প্রতি হাজার বছরের শেষে এক একজন দ্বীনী সংস্কারক পাঠান, যিনি বিশ্ব বাসীকে মহান আল্লাহর খাঁটি দ্বীন সম্পর্কে অবহিত করান। যখন গোটা ভারতে মোগল সম্রাট আকবরের প্রবর্তিত মতবাদ দ্বীন-ই-ইলাহী মুসলমানদেরকে ভুলপথে পরিচালিত করছিল। এমনি এক যুগ সন্ধিক্ষনে আল্লাহর খাঁটি বান্দা শেখ আহমাদ সিরহিন্দ যিনি মুজাদ্দিদে আলফেসানী নামে পরিচিত, আকবরের এই ভ্রান্ত মতবাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান।

দ্বিতীয় সহস্রের সংস্কারক ইলমে জাহেরী ও ইলমে বাতেনী তথা শরীআত ও মারেফাতের ওলীয়ে কামেল শায়খ মুজাদ্দিদে আলফেসানী পূর্ব পাঞ্জাবের সিরহিন্দ নামক স্থানে ৯৭১ হিজরীর ১৪ ই শাওয়াল শুক্রবার জন্ম গ্রহণ করেন। বাল্যকাল থেকেই তাঁর মধ্যে অসাধারণ ব্যক্তিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। পড়াশুনাতে ও তাঁর তীক্ষ্ম মেধা ছিল। সাত বৎসর বয়সে তাঁকে তদানীন্তন কানপুর ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি করান হয়। তিনি তথায় তাফসীর, হাদীস, ফিকাহ, ইসলামের ইতিহাস দর্শন প্রভৃতি শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন এবং সর্বোচ্চ পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করেন।

মুজাদ্দিদে আলফেসানী অধ্যয়ন সমাপ্তে দ্বীনের খেদমতে আত্মনিয়োগ করেন। উপমহাদেশে তাঁর আগমন না ঘটলে ইসলামের জ্যোতি এ অবস্থায় থাকতো কিনা সন্দেহ। কারণ সে যুগের অধিকাংশ জালেম একে অন্যকে কাফের, মুশরিক, বেদআতী গোমরাহ ইত্যাদি ফত্‌ওয়া দানে লিপ্ত ছিল।

মোগল সম্রাট আকবর সিংহাসনে আরহন করে হিন্দু সম্প্রদায় ও রাজপুতদেরকে হাত করার জন্য এক নতুন ধর্মীয় মতবাদ জারী করেন। প্রথমে তিনি ধর্ম নিরপেক্ষতা শাসননীতি প্রবর্তন করত: জিযিয়া কর ও তীর্থ যাত্রীর কর রহিত করেন। এর পরই 'দীন-ই-ইলাহী' নামক নব ধর্মের প্রতিষ্ঠার জন্য উঠে পড়ে লাগলেন। এই জঘন্য মতবাদ চালু করার পর আকবর হিন্দুদের অধিকতর সম্মানের পাত্র হয়ে গেলেন। ইসলামী বিধি-বিধান সম্পর্কে নিজের মনগড়া বানানো

রায়কেই চূড়ান্ত বলে দেশের সর্বত্র জারী করলেন। সম্রাট আকবর প্রত্যহ চার বার সূর্যের পূজা করতেন এবং হিন্দী ভাষায় লিখিত সূর্যের বার হাজার নাম জপতেন। সম্রাট আকবর যে কত বড় গোমরাহ ছিলেন তা তার অন্ধকারে গা ঢাকা জীবন চরিতের দিকে তাকালেই সচেতন ও জ্ঞান বান মুসলিম মাত্রই বুঝতে পারবেন। তাঁর দ্বীন-ই-ইলাহীর কলেমা ছিল 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আকবারু খলীফাতুল্লাহ'। (নাউযুবিল্লাহ) গো-যবাহ করা আকবরের আমলে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ছিল। আকবরের এহেন অনৈসলামিক ও মনগড়া আইন কানুনের জালে আবদ্ধ হয়ে দেশের মুসলিম জনতা এবং ইসলাম ধর্ম যখন দুর্দশা গ্রস্ত হতেছিল, সে সংকট মুহূর্তে শেখ আহমাদ সিরহিন্দ মুজাদ্দিদে আলফেসানী (রাঃ) এর আবির্ভাব ঘটে। তিনি নিজ জন্ম ভূমি সিরহিন্দ থেকেই দ্বীনের তাবলীগ শুরু করেন। সম্রাট আকবরের অনৈসলামিক কার্যাবলী ও মুসলমানদের উপর তার নির্মম অত্যাচার উৎপীড়ন সবই মুজাদ্দিদে আলফেসানী অবগত হলেন। তিনি আকবরের বিশেষ লোকদেরকে ডাকিয়ে এনে বলে দিলেন যে, 'আকবর রাসূল (সঃ) এর আদর্শ তথা ইসলামের বিরোধী কার্যকলাপ করেছে। তোমরা তাকে এসব করতে নিষেধ কর। অন্যথায় তার উপর আল্লাহর লা'নত বর্ষিত হবে।' শেখ আহমাদের উক্ত বানী সমূহ আকবরের নিকট পৌঁছান হল, কিন্তু তাতে কোন ফল হল'না। আকবরের উচ্চ স্তরের কর্মকর্তাগণ মুজাদ্দিদে আলফেসানীর আধ্যাত্মিক শক্তি ও অলৌকিক ক্ষমতার কথা বলেও আকবরকে ভয় দেখালেন, যার ফলে তিনি তাঁর রাজ্যে ঘোষনা করতে বাধ্য হলেন যে, যে কোন লোক স্বেচ্ছায় যে কোন ধর্ম মেনে চলতে পারবে, তাতে তাদের পাকড়াও করা হবে না।

আকবর তাঁর সাম্রাজ্যের উচ্চ পদস্থ হিন্দুদের পরামর্শ ক্রমে 'দরবারে মুহাম্মদী' ও 'দরবারে আকবরী' নামক দুটি দরবারের ব্যবস্থা করেন। একদা তিনি জনতাকে নিমন্ত্রন দিয়ে উক্ত মোহাম্মদী দরবারকে ছেড়া ও জীর্ন তাবু দিয়ে ঘেরাও দেওয়া হয় আর দরবারে আকবরীকে উন্নত মানের তাবু দিয়ে সুসজ্জিত করা হয়। মুজাদ্দিদের আলফেসানী দরবারে মুহাম্মদীতে যোগদান করতঃ তাঁর একজন শিষ্যকে দিয়ে একটি লাঠির দ্বারা মুহাম্মদী দরবারের চতুর্দিকে একটি রেখা আঁকেন আর মুজাদ্দিদে আলফেসানী সাহেবের হাত থেকে একমুঠি বালু নিয়ে দরবারে আকবরীর দিকে নিক্ষেপ করলেন। হঠাৎ ভীষণ ঘূর্ণি ঝড় এসে দরবারে আকবরীর তাবু, বিছানা ও খাদ্য সামগ্রী সহ সব কিছুই উল্টে গেল। অনেকেই আহত হলে এবং অনেকে মারা গেল। কিন্তু দরবারে মুহাম্মদীর কোনই ক্ষতি হয়নি। এর কিছুদিন পরে সম্রাট আকবর মারা যায়। তার দ্বীন-ই-ইলাহী কোন কাজে আসেনি। আবার সর্বত্র ইসলামের ন্যায় নিষ্ঠা বানী তথা তাওহীদের বানী সমুন্নত হয়। এ জন্যই বলা হয় —

"ইসলাম জিন্দা হোতা হায়, হার কারবালাকে বাদ"। অর্থাৎ প্রত্যেক সংগ্রামের পর ইসলাম পুনঃ জীবিত হয়।

* যে ব্যক্তি প্রতারনায় আশ্রয় নেয়, সে আমাদের দলভুক্ত নয়। (তিরমিজী)

যুদ্ধ এবং অস্ত্র

মোঃ শহীদুল আলম
৮ম শ্রেণী, "খ" শাখা

যুদ্ধ, যুদ্ধ আর যুদ্ধ। বর্তমান বিশ্বের বেশ কয়েকটি দেশ এখন যুদ্ধের নেশায় পাগল প্রায় হয়ে উঠছেন। যুদ্ধের জন্য দরকার নানা রকম অস্ত্র।

আগে যুদ্ধক্ষেত্রে সৈনিকেরা তলোয়ার বর্শা ইত্যাদি অস্ত্র দিয়ে এক জনকে বা একসঙ্গে কয়েক জনকে হত্যা করত। সৈনিকদের মধ্যেই শুধু সেই সময় যুদ্ধ সীমাবদ্ধ থাকত। বাইরের কোন মানুষ তা দ্বারা প্রভাবিত হতোনা। কিন্তু বর্তমানে মানুষ যুদ্ধের জন্য তৈরী করছে বিভিন্ন প্রকার মারনাস্ত্র, যা কল্পিত দেবতা ইন্দ্রের মারনাস্ত্রকে ও হার মানায়। এতে একটি দেশের সব লোক মারা পড়ছে আর যারা বেঁচে থাকছে তারা হচ্ছে অকর্মন্য, পঙ্গু আর কাজ করার অযোগ্য। কোন কাজ করার ক্ষমতা তাদের থাকছে না।

বেশী দিন আগের কথা নয়। ১৯৪৫ সনের ৬ই আগষ্ট হিরোশিমাতে যে এ্যাটম বোমা ফেলা হয়েছিল তাতে ৬০ হাজার লোকের মৃত্যু হয়েছিল। আর ২ লক্ষ লোক আহত ও অকর্মন্য হয়ে গিয়েছিল চিরদিনের জন্য। কিন্তু সেই বোমা ছিল বর্তমান হাইড্রোজেন বোমার চেয়ে আরো কম শক্তি সম্পন্ন।

আমেরিকার তারকা যুদ্ধের ব্যাপক প্রস্তুতির কথা অনেকেই শুনেছেন। ১৯৮৩ সনের ২৩শে মার্চ আমেরিকার সাবেক প্রেসিডেন্ট রোনাল্ড রিগ্যান ঘোষণা করেন যে তিনি এস, ডি, আই, এর সাহায্যে গড়ে তুলতে চান এমন একটি প্রতিরক্ষার ছাতা, যা তার দেশকে পারমাণবিক আক্রমন থেকে রক্ষা করবে। তিনি সোভিয়েত রাশিয়ার দিক হতে সতর্ক হতে চেয়েছিলেন আর কি। কিন্তু সোভিয়েত রাশিয়া ও বসে নেই। তারাও গবেষণা চালাচ্ছে। তবে আমেরিকা প্রকাশ্যে আর সোভিয়েত রাশিয়া গোপনে। দুই দেশই পরস্পরের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য সব কিছুইই তৈরী করে রেখেছে। কিন্তু এর ফল কি হবে কেউ কি তা ভাবতে পারেন? যুদ্ধের ক্ষতিকর প্রভাবে পৃথিবীর মানুষও প্রভাবিত হবে।

আধুনিক বিশ্বে দুর, মাঝারি ও স্বল্প পাল্লার ক্ষেপনাস্ত্র তৈরী করা হচ্ছে। তৈরী হয়েছে সারফেস টু সারফেস, সারফেস টু এয়ার, এয়ার টু এয়ার, মিসাইল। এদের মধ্যে সব চেয়ে বিপজ্জনক অস্ত্রটি হচ্ছে আই, সি, বি, এম, বা ইন্টারকন্টিনেন্টাল ব্যালিস্টিক মিসাইল। এই ধরনের একটি ক্ষেপনাস্ত্র রাশিয়ার কোন দেশ থেকে ছুড়ে দিলে ২০ মিনিটের মধ্যে স্বয়ংক্রিয় ভাবে ছুটে গিয়ে আঘাত হানবে লক্ষ্যবস্তুর উপর। আবার আমেরিকান সাবমেরিন বাহিত একটি মাত্র ক্ষেপণাস্ত্র প্রায় ২০টি সোভিয়েত শহরকে ধ্বংস করে দিতে পারে। আমেরিকা এবং রাশিয়ার মোতায়েন করা ক্ষেপনাস্ত্রের সংখ্যা প্রায় ২০,০০০।

হাইড্রোজেন বোমার আবিষ্কারক হচ্ছেন এডওয়ার্ড টেলর। তিনি আবিষ্কার করেছেন এক্সরে লেজারগান। এই রশ্মি অত্যন্ত শক্তিশালী এবং অদৃশ্য। ক্ষেপণাস্ত্রকে ঠেকিয়ে রাখতে এর জুড়ি নেই। আর এই সব অস্ত্র ব্যবহার করা হবে সুপার কম্পিউটারের আদেশে। যে কম্পিউটার এক সেকেণ্ডের মধ্যে কয়েক লক্ষ অংক কষতে পারে। ফলে লক্ষ্য বস্তুর উপর মিসাইল ঠিকই আঘাত হানবে। কিন্তু এর ক্ষতিকর প্রভাব অন্যান্য দেশের উপর পড়বে। বিজ্ঞানীরা হিসাব করে দেখেছেন একবার পারমাণবিক যুদ্ধ শুরু হলে তার সরাসরি আঘাতেই মারা পড়বে শতকরা ৯৫ ভাগ মানুষ। যারা বেঁচে যাবেন তারা প্রাকৃতিক ভারসাম্য এবং অকর্মন্যতা থেকে রক্ষা পাবেন না।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যুদ্ধ মানব সভ্যতার জন্য এক মারাত্মক অভিশাপ। খোদ আমেরিকায় শান্তি প্রিয় মানুষ যুদ্ধ বিরোধী সমাবেশ করছে।

বিজ্ঞান আমাদেরকে দান করেছে বিভিন্ন কীর্তি। তেমনি এইসব কীর্তি মানুষ মুহূর্তের মধ্যে ধ্বংস করে দিতে পারে। কথায় বলে জিনিস তৈরী করা কঠিন কিন্তু ধ্বংস করা সহজ। সুতরাং আমেরিকা, রাশিয়া এবং অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের বিবেকবান মানুষেরা যুদ্ধ রোধ সম্পর্কে ভেবে দেখবেন কি ?

—০—

★ পৃথিবীর অধিবাসীদের প্রতি সদয় হও, তাহলে উর্ধালোকের প্রভু ও তোমাদের প্রতি সদয় থাকবেন। (তিরমিজী)।

বন্যা

—আশরাফী সায়েদুল মোরসালীন
৮ম শ্রেণী 'ক' শাখা

জীবনকে বাজি রেখে বন্যার উত্তাল প্রমত্ত ঢেউয়ের মাঝে সাতার কাটছে ওরা তিনজন। রহিমের মা, রহিম ও তার ছোট বোন। ওরা তিনজন বাচতে চায়। তাই এই উত্তাল ঢেউয়ের এক সর্বগ্রাসী দানবের মধ্যে নিমজ্জিত ঘর ছেড়ে আজ তারা শহর গামী। সাতার কাটতে কাটতে হঠাৎ রহিমের মনে পড়ে গেল গত বছরের কথা। সেবারও বন্যা হয়েছিল এবং শহরে ও গিয়েছিল কিন্তু তাদের সাথে যায়নি তার বাবা। নদী যখন প্রবল ঢেউয়ের মাঝে উন্মাদে পরিনত হয়েছিল তার মাঝে তার প্রাণ প্রিয় পিতায় সমাধি হয়েছিল।

সেদিন ছিল শুক্রবার। সূর্য যখন পূর্ব আকাশে মাথা তুলেছে তখন বন্যার পানিও তাদের চালার উপর মাথা তুলেছে। পানি বাড়ায় তারা ঘরের চালের উপরে আশ্রয়ের আশায় উঠেছিল কিন্তু আজ আর থাকা সম্ভব নয়। পানি চালার উপরে উঠে গেছে। জীবন ও জীবিকার জন্য আজ তাদের ঘর ছাড়তে হবে। তখন তার বাবার ছিল ভীষন জ্বর। পানি ডিঙ্গিয়ে রোজগার করতে করতে তার এই জ্বর হয়েছিল। বন্যার পানি বাড়াতে অগত্যা তাদের যেতেই হবে। তারা নদী পার হওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিল। সাতার কাটতে কাটতে তারা যখন মাঝ নদীতে এসে পড়ল, তখন তার বাবা ভীষণ ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। তবুও সে সাতার কাটছিল। কিন্তু এই উত্তাল ঢেউয়ের বিরুদ্ধে তার সাতারের জন্য দু'হাত অতি নগন্য।

যা হোক। এই ভাবতে ভাবতে তারা অপর পাড়ে এসে পড়ল। শহরের এক স্কুলে তার আশ্রয়ের আশায় এলো, কিন্তু পেলনা। আশ্রয় স্থল বন্যা পীড়িত মানুষে পরিপূর্ণ হয়ে গেছে। কাজেই রহিম অন্য এক স্কুলের গাছের নীচে আশ্রয় নিল। কিন্তু এখন হলো খাবারের চিন্তা। সরকারের তরফ অথবা অন্যান্য সংগঠন থেকে যা পাওয়া যায় তা কোন মতে চলে। তাছাড়া নিজেদের কিছু রান্না করতে হয়। অতএব জীবন ও জীবিকার জন্য রোজগারের আশায় রহিম শহরের পথে পথে ঘুরে বেড়াল। এক জায়গায় কাজ করার জন্য গিয়ে মার (পিটুনি) খেয়ে ফিরে এলো। কারণ কারা তাকে কাজ দেবে। সে যদি কাজ করতে যায় তাহলে তার জন্য অন্যেরা দু'পয়সা বেশী রোজগার করতে পারবেনা। যা হোক এক জায়গায় কুলিগিরি করে কিছু আয় হলো। এরপর সে আবার স্কুলে এলো। কিন্তু এসে দেখল যে, জায়গায় তারা আশ্রয় নিয়েছিল সে জায়গা শূন্য। একজনকে জিজ্ঞেস করে জানতে পারল যে, সে যাওয়ার পর তার মা খুব অসুস্থ হয়ে পড়ে এবং মারা যায়। পরে স্বেচ্ছা সেবকরা তাকে অন্য জায়গায় দাফন করতে নিয়ে যায়। আর তার বোন তারই খোঁজে কোথায় যেন বেড়িয়ে গেছে। এরপর রহিম তার বোনের খোঁজ করল, কিন্তু পেল না।

ঢাকা গভর্নমেন্ট মুসলিম হাই স্কুল/বাষিকী

বন্যা শেষ হওয়ার কিছু দিন পরের কথা। রহিম আবার ঘর মুখো হলো। কিন্তু গিয়ে দেখল সে জায়গায় আর এক পরিবার এসেছে! তা দেখতে সে এক ঘরে ঢুকল। কিন্তু চোর বলে মার-ধোর খেয়ে এলো।

রহিম আজ পথে পথে ঘুরে। বন্যা তার সর্বস্ব গ্রাস করেছে। রহিম এখন কি করবে? কে দেবে তাকে অন্ন? সে কি জীবন থেকে পালিয়ে যাবে? নাকি জীবনের এই পিচ্ছিল পথে চলার জন্য অসৎ উপায় গ্রহণ করবে? আজ বাংলাদেশের হাজারো রহিমের একই চিন্তা, হাজারো রহিমের একই মর্মভেদী কথা! কে দেবে এই প্রশ্নের উত্তর?

—০—

★ যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের দোষ ত্রুটি গোপন রাখে, আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন তার দোষত্রুটি গোপন রাখবেন।

(আবু দাউদ)

★ মূর্খতা এমন এক পাপ, সারা জীবনে যার প্রায়শ্চিত হয় না।

(আল ফখরী)

তরুন সমাজের অবক্ষয়ের কারণ ও তার প্রতিকার

শাহানা নাসরীন
সহকারী শিক্ষিকা

মানুষ আশ্‌রাফুল মাখ্‌লুকাত অর্থাৎ সৃষ্টির সেরা জীব। কিন্তু এই মানুষই যখন পৃথিবীতে প্রথম এসেছিল তখন সে ছিল দিশেহারা। কি ভাবে আহার করবে, কি ভাবে চাষাবাদ করবে, কি ভাবে সমাজ গড়ে তুলবে, এ সম্বন্ধে সে ছিল সম্পূর্ণ অজ্ঞ, কিন্তু কালের পরিবর্তন দ্রুতগতিতে ধাবমান। বিবর্তনের ছোঁয়ায় মানুষ গড়ে তুললো সমাজ। প্রয়োজনের তাগিদে মানুষ জীবন কাটাতে লাগলো সমাজ বদ্ধ হয়ে।

বর্তমান সমাজ বদ্ধ পৃথিবীতে মানুষের যে জীবন ধারা চলছে তার দিকে দৃষ্টিপাত করলে মনটা আতঙ্কিত হয়ে উঠে। মনে প্রশ্ন জাগে কেন মানুষ আগের মত অজ্ঞ রইল না? কেন তারা গড়ে তুলেছিল সমাজ ব্যবস্থা?

সমাজ জীবনে আজ যে উশৃঙ্খলতার ঢেউ লেগেছে, তরুন সমাজ হচ্ছে তার সবচেয়ে বড় শিকার। তরুনদের মধ্যে যে নৈতিক অবক্ষয় দেখা যাচ্ছে, তা জাতির জন্য অত্যন্ত মারাত্মক। এই নৈতিক অবক্ষয়ের ফলে তরুন ও যুব সমাজ ক্রমেই হয়ে পড়ছে দিশে হারা। অথচ তরুন সমাজই হচ্ছে একটি সমাজ তথা দেশের কর্ণধার। সমাজ আজ ছিনতাই, রাহাজানি, মাদকা শক্তি, অশ্লীলতা, খুন, অপহরণ, এসিড নিক্ষেপ, ব্যাঙ্ক ডাকাতি ইত্যাদির শিকার। বিশেষ করে তরুন সমাজের মধ্যেই পরিলক্ষিত হচ্ছে এসব চরিত্র বিধ্বংসী কাজের প্রতিযোগীতা।

এ ব্যাপারে আমাদের গভীর ভাবে চিন্তা করে বের করতে হবে যে এ দুরবস্তার জন্য দায়ী কে? আমাদের সমাজের শিকড় বা মূল, অর্থাৎ সমাজের একটি শিশুর হাতে খড়ি হয় যেখানে, সে পরিবারকেই সর্বাগ্রে দায়ী করা যায়। একটি শিশু যখন ভুমিষ্ঠ হয় তখন সে থাকে নিষ্পাপ ও কলুষ-মুক্ত। তারপর তার পারিবারিক পরিবেশের দ্বারাই তার অনুভূতি ও মানসিক উৎকর্ষ প্রভাবান্বিত হয়। শিশু যখন ১২/১৩ বছরে পদার্পন করে, তখন হঠাৎ করেই একটা দ্রুত পরিবর্তন আসে-তার শরীর ও মনে। প্রত্যেকেই একজন আলাদা ব্যক্তি সত্তা নিয়ে নিজ নিজ অধিকার সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠে। শিশু সুলভ আচরণ পেরিয়ে বড় হয়ে উঠেছে, এমন একটা ভাব তার মধ্যে ক্রিয়াশীল হয়ে উঠে। এরূপ পরিবর্তন সর্বদাই গুরুতর সমস্যার সৃষ্টি করে এবং পিতা-মাতা ও কিশোর উভয়কেই কিংকর্তব্যবিমূর করে এক অনিশ্চিয়তার মধ্যে ফেলে। এমতাবস্থায়, যদিও সে নিজেকে নিজের ব্যাপারে সম্পূর্ণ উপযুক্ত

মনে করে, তথাপি সে বড়দের কাছ থেকে প্রতিরক্ষা ও পরিচালনা প্রত্যাশা করে। তখন সে তার দুর্বলতা প্রকাশ করতে চায় না বরং, তার পরিবারের বয়স্কদের প্রতি অবাধ্য ও অযৌক্তিক হয়ে উঠে। এ সময় যদি পারস্পরিক বিশ্বাস ও স্নেহ ভালবাসা পূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টি করা যায়, তাহলে ক্ষতিকর দিকটি সহজেই এড়ানো যায়।

তরুন সমাজের অবক্ষয়ের আর একটি কারণ হচ্ছে যে, তারা আজকাল অধ্যয়নে বিমুখ হয়ে উঠেছে। তাদের কাছে অধ্যয়ন হচ্ছে কষ্টসাধ্য ও নিরানন্দ। যে ছাত্র লেখা পড়ায় আনন্দ পায়, সে অবশ্যই একজন শিক্ষিত ও আদর্শ নাগরিক হয়ে জীবন যুদ্ধে জয়ী হবে। আর যে ছাত্রটি লেখা পড়ায় আনন্দ পায় না সে তার সুকোমল বৃত্তি গুলোকে বিসর্জন দিয়ে শুরু করে স্কুল পালানো, শ্রেণী কক্ষে অন্যের বই-খাতা ও টাকা-পয়সা চুরি করা, ঝগড়া ফ্যাসাদ, মারামারি করা ইত্যাদি। শুধু তাই নয় খেলাধূলায় প্রতিযোগীর নিকট পরাজিত হয়ে, হয়ে উঠে অযৌক্তিক ভাবে হিংসা পরায়ন। এটা শুধু সহপাঠিদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ না থেকে সমাজের অন্যান্য স্তরে ও বিস্তৃতি লাভ করে। ক্রমে ক্রমে তা এমন পর্যায়ে পৌঁছে যে সেখান থেকে সবার পক্ষে ফিরে আসা সম্ভব হয়ে উঠে না বরং, মনের অজান্তে বৃহত্তর অপরাধ জগতে পা বাড়ায়। তখন গৃহত্যাগ করা সহ কেউ কেউ হয়ে উঠে নেশাখোর, ছিনতাইকারী, ডাকাত, খুনী ইত্যাদি। পিতা-মাতা; অভিভাবক এবং শিক্ষকগণ যদি এসব ব্যাপারে যথাযথ ভাবে দায়িত্ব পালন করেন তবে তাদের পদস্খলনের সম্ভাবনা অনেকাংশে রহিত হবে এবং তারা একজন সুনাগরিক হিসেবে গড়ে উঠতে পারবে।

কোন অবস্থাতেই সন্তানের প্রতি পিতা-মাতার অবহেলা বা স্নেহের কার্পন্য দেখানো যাবে না, সব সন্তানের রূপ, গুন ও মেধা এক রকম হয় না, তাই বলে স্নেহের কোন বৈষম্য হওয়া উচিত নয়। কারণ এক সন্তানের তুলনায় অন্য সন্তানের প্রতি পিতা-মাতার অধিক স্নেহ অন্য সন্তানকে হতাশ করে এবং অপরাধ প্রবণতার দিকে ঠেলে দেয়। বিমাতা বা অন্য কোন আত্মীয় স্বজনের অসদাচরনের প্রভাবে ও শিশু কিশোরেরা অপরাধী হয়ে উঠতে পারে। সে জন্য নৈতিক মূল্যবোধ উন্নত করতে হলে সর্ব প্রথম অভিভাবকদের সচেতন হতে হবে।

এর পর আসছে বিনোদনের কথা। ভাল পরিবেশ এবং উৎকৃষ্ট বিনোদনের দিকে খেয়াল রাখা উচিত। ভাল সাহিত্য, মার্জিত রুচির পত্র পত্রিকা ও শিক্ষামূলক ছায়াছবি দ্বারা তরুন সমাজের মানসিক উন্নতি সাধন করতে হবে। বর্তমানে আমাদের দেশে যে সস্তা, কু-রুচিপূর্ণ ছবি প্রদর্শিত হয় তাতে আমাদের আর্থ সামাজিক প্রেক্ষাপটের কোন চিত্রই ফুটে উঠে না, উপরন্ত বিদেশী মারদাঙা মার্কা ছায়াছবি গুলিতে কথায় কথায় গুলি, মারামারি, খুন, ছিনতাই এসব ব্যাপারে উৎসাহ দেওয়া হয়। এসব ছবি বিদেশ থেকে আনা বন্ধ করলে তরুণ সমাজ অনেকটা অপরাধ মুক্ত থাকবে।

ঢাকা গভর্নমেন্ট মুসলিম হাই স্কুল/বার্ষিকী

সমাজের প্রভাবশালী—ব্যক্তিদের কেউ কেউ তরুন সমাজের বিপথগামী হওয়ার জন্য অনেকাংশে দায়ী। তাদের প্রভাববলয় বৃদ্ধির জন্য বা বিরোধী পক্ষকে প্রতিহত করার জন্য তারা তরুনদেরকে যোগান দেয় অস্ত্র, অবৈধ চাঁদা আদায়ের সুযোগ, নেশা করার উপকরণ ইত্যাদি। পুলিশের হাতে কখনো ধরা পড়লে এ প্রভাবশালী মহলই তদবির করে তাদেরকে ছাড়িয়ে আনে। মানবতার আর্তনাদ, সভ্যতার উপাদান রক্ষা করা, এর কোন কিছুই তাদের বিবেক স্পর্শ করে না। সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টার দ্বারা এসব ছত্রচ্ছায়াদানকারী প্রভাবশালী মহলের স্বরূপ সমাজের সম্মুখে উন্মোচন করেই তাদের এই হীন কার্যকলাপ প্রতিহত করা সম্ভব হবে এবং তরুন সমাজকে তাদের হিংস্র থপ্পর থেকে উদ্ধার করা যাবে।

তরুনদেরকে বিশেষ করে কিশোরদেরকে মা-বাবা, অভিভাবক, বয়োজেষ্ঠ এবং শিক্ষকদের সাথে নৈতিকতা বিরোধী ব্যাপারে অকপটে—আলাপ করে উপদেশ গ্রহণ করতে হবে। কুসংসর্গ ও কুকাজ এড়িয়ে চলতে হবে। যা ভাল নয় তা আপাত: সুন্দর ও সুখের মনে হলেও তা থেকে দূরে সরে থাকতে হবে, কারণ মন্দ অভ্যাস একটু একটু করেই গড়ে উঠে।

সর্বোপরি, মনে রাখতে হবে যে, জ্ঞান অর্জনই যুব ও তরুন সমাজের প্রধান কর্তব্য। একমাত্র উপযুক্ত জ্ঞানই পারে তাদেরকে সঠিক পথের সন্ধান দিতে। জ্ঞান অর্জন বলতে পাশ্চাত্য সমাজ ও সভ্যতার অপসংস্কৃতি শিখে জীবনকে অন্ধভাবে পরিচালিত করা নয়, ধর্মীয় মূল্যায়নে মূল্যায়িত হওয়ার মধ্যেই রয়েছে তরুন সমাজের আসল সার্থকতা।

বাংলাদেশ একটি ইসলামী দেশ। এদেশের শতকরা নব্বই জনই মুসলমান। ইসলামের শ্রেষ্ঠ নবী হযরত মুহম্মদ (সঃ) বলেছেন, "প্রয়োজন হলে সুদূর চীন দেশে গিয়েও বিদ্যা অর্জন কর।" কষ্টার্জিত জ্ঞানকে সমাজ গঠনমূলক কাজে নিয়োগ করা এবং জীবন ও জীবিকার তাগিদে সম্ভাব্য সৎকাজে অংশ গ্রহণ করার কথাও ইসলাম ধর্মে বলা হয়েছে। আমাদের সমাজে যে সমস্যা ও সঙ্কট দেখা দিয়েছে এই সঙ্কট নিরসনের জন্য কোরান ও হাদিসকে অনুসরণ করতে হবে। কোরান ও হাদিসের আলোকে, প্রগতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে চললে স্বাভাবিক ভাবেই আমাদের সমাজ থেকে দূরীভূত হবে সকল অনাচার, ব্যাভিচার, শয়তানী প্ররোচনা, কলুষ কামনা, অশ্লীলতা এবং বল্গাহীন অপসংস্কৃতি। এভাবেই সৃষ্টি হবে স্বর্গের ন্যায় অনাবিল শান্তিপূর্ণ এক আদর্শ সমাজ ও দেশের।

★ যে ব্যক্তির প্রতিবেশী তার অত্যাচার ও অন্যায় আচরন থেকে রক্ষা পায় না, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না। (মুসলিম)

—×—

ডাইনোসরকে জানো

মনিরুজ্জমান
৮ম—খ

পরিচিতি ঃ—এ পর্যন্ত দুনিয়ায় যত রকম জীব এসেছে তাদের মধ্যে ডাইনোসর সবচেয়ে বড়। ডাইনোসর আসলে এক প্রকার খুব বড় ভয়ংকর টিকটিকি। এ ছাড়া এদের আর কিছুর সঙ্গে তুলনা করা যায় না। ডাইনোসর এক প্রকার সরীসৃপ। এক সময় এই দুনিয়াতে এদের প্রাধান্য সবচেয়ে বেশী ছিল। প্রথম ডাইনোসর জাতীয় প্রাণীর জন্ম ২০ কোটি বছর আগে। আর সরীসৃপের জন্ম ১৪ কোটি বছর আগে। ডাইনোসরের যুগটি আরম্ভ হয় ২০ কোটি বছর পূর্বে আর শেষ হয় ৬ কোটি বছর পূর্বে। কোন জীবিত মানুষ ডাইনোসর দেখেনি কারণ মানব জাতির জন্ম ১০ লক্ষ বছর আগে। ১৮১৮ সনে প্রথম ডাইনোসরের কংকাল পাওয়া যায় ১৮২২ সনে ডাঃ সিডন ম্যান্টিলে ইংল্যাণ্ডের সাসেক্সের পাহাড়ে। তিনি এর নাম দিলেন "ইগোয়োনাডন"। পরে স্যার রিচার্ড আওয়েন এর নাম দিলেন "ডাইনোসর"।

প্রকারভেদ ঃ—ডাইনোসর তিন প্রকার—জলচর ডাইনোসর, উড়ন্ত ডাইনোসর, স্থলচর ডাইনোসর।

জলচর ডাইনোসর ঃ—এই ডাইনোসর ৩০ ফুট উচু এবং ১৬ ফুট লম্বা কঙ্কাল পাওয়া গিয়াছে। এরা ছিল সাতারু। এরা থাকত সাগর পারে। এদের মোট দাঁত ছিল ৫০০টি উভয় পাশে সাজান ছিল। এই জীবের মাথায় একটি ঝুটি থাকতো সেখানে তারা বাতাস পুরে রাখতে পারতো। তৃণ পাতাই ছিল এদের খাদ্য।

উড়ন্ত ডাইনোসর ঃ—উড়ন্ত ডাইনোসর ছিল আকাশের রাজা। এদের পাখা ছিল বাদুরের পাখার মতো এরা ঝাকে ঝাকে উড়ত। এদের কারো ছিল লেজ, কারো লেজ ছিল না। এদের ঠোঁট ছিল বিরাট দাঁত ছিল না। ডানা দুটো বিশ ফুটের চেয়েও বড় হতো। এদের হাড় ফাঁপা। এই কারণে তারা হালকা। পোকা মাকর ও সাগরের মাছ এদের খাদ্য।

স্থলচর ডাইনোসর ঃ—এই ডাইনোসর ছিল দুই প্রকার, তৃণভোজি ও মাংশভোজি। এরা খুবই বড় ছিল। তাদের পিছনের দুই পা খুব শক্তি ছিল।

১৮২১ সালে মেরী এ্যানিং এই বড় প্রানির সন্ধান পান।

ডিম থেকে ডাইনোসরের বাচ্চা হয়। গোবী মরুভূমিতে এই ডিম পাওয়া যায়।

ডাইনোসরের মৃত্যু ঃ—কোন ঘটনাকে এই জিবের মৃত্যুর কারণ করা যায় না। পৃথিবীর পরিবর্তনে তাদের খাদ্যের অভাব ও আবহাওয়ার কারণে তারা ধ্বংস হয়ে যায়। সাগর শুকিয়ে যায়। ইত্যাদি কারণে হয়ত এরা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। থাকে শুধু এদের কংকাল।

★ যে পরিমিত ব্যয় করে সে অভাব গ্রস্থ হয় না। (মুসনাদে আহ্‌মদ)

—০—

ভিটামিন 'সি'

মোঃ সালাহ উদ্দিন
দশম শ্রেণী 'ক' (মানবিক বিভাগ)

ভিটামিন 'সি'-এর কথা জানতে হলে, প্রথমে আমাদের জানতে হবে ভিটামিন কি ?

১৯১০ সালে পোল্যাণ্ডের বিজ্ঞানী 'ক্যাসিমির ফুঙ্ক' চাউলের কুড়া থেকে বেরিবেরি রোগ নিরোধক যে রাসায়নিক বস্তু আবিস্কার করেন, তাকেই তিনি সর্বপ্রথম ভিটামিন নামে অভিহিত করেন। যেসব রাসায়নি পদার্থ বিভিন্ন খাদ্য বস্তু অল্প মাত্রায় থেকে আমাদেরকে জীবনী শক্তি দান করে এবং আমাদের দেহের সুষ্ঠু বৃদ্ধি সাধন করে সেগুলোকে ভিটামিন বলে। বর্তমানে বিভিন্ন ভিটামিনকে আমরা ইংরেজী বিভিন্ন অক্ষর দ্বারা প্রকাশ করি, যেমন —এ, বি, সি, ডি' ই, কে প্রভৃতি।

ভিটামিন — 'সি' এর অভাবে দেহে স্কার্ভি রোগ হয়। স্কার্ভি রোগের ফলে শরীররের বিভিন্ন স্থানে রক্তনালী থেকে রক্ত নির্গত হয়। দাঁতের মাড়ি ফুলে আলগা হয়ে রক্ত পড়ে, শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর রক্ত ঝরে, চর্মে কালশিরা পড়ে, পেশী ও গিটে রক্তপাত, ব্যথা ও স্ফীত হয়। শেষ পরিনামে রোগীর মৃত্যুও হতে পারে। এছাড়া ভিটামিন 'সি' এর অভাবে আমাদের দাঁতের স্বাস্থ্যহানী ঘটে এবং দাঁতে বিভিন্ন প্রকার রোগ দেখা দেয়।

১) ভিটামিন 'সি' আমাদের কি উপকারে আসে ঃ—

সাধারণ সর্দি-কাশি-বিশ্ববিখ্যাত রসায়নবিদ নোবেল পুরস্কার বিজয়ী বিজ্ঞানী লিনাস পলিং দাবী করেছিলেন যে, 'ভিটামিন' সি' একটি যাদুকরী সাধারণ উপাদান। ১৯৭০ সালে তিনি সর্দি-কাশি প্রতিরোধ ও নিরাময়ের জন্য ২৫০ মিলিগ্রাম থেকে ১ গ্রাম ভিটামিন 'সি' ব্যবহারের নির্দেশ দিয়ে ছিলেন। ১ গ্রাম ভিটামিন 'সি' মূলতঃ সর্দি-কাশি নিরাময় করে। মার্কিন বিজ্ঞানীরা কয়েক হাজার স্বেচ্ছাসেবীকে ৫০০ মিলিগ্রাম থেকে কয়েক গ্রাম ভিটামিন 'সি' দিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে-ছিলেন। এর ফলে ঠান্ডায় আক্রান্তদের ভোগান্তির সময়সীমা কমে আসে, এর চেয়ে কম পরিমানের ভিটামিন 'সি' দিয়েও ভাল ফল পাওয়া গেছে। ইংল্যান্ডের মিডলসেকসের এক হাসপাতালে দেখা গেছে যে, প্রতিদিন বাড়তি ৬ আউন্স পরিমানের কমলার রস (৮০ মিলিগ্রাম ভিটামিন 'সি') পানের ফলে ঠান্ডায় আক্রান্ত থাকার মেয়াদ কমে গেছে। এমনিতে ও দেখা গেছে নিয়মিত ৬ আউন্স ভিটামিন যারা পান করেন, তারা সহজে ঠান্ডায় আক্রান্ত হন না। অবশ্য এর বিপরীত মতামত ও চিকিৎ-সকদের আছে।

২) হৃদরোগ ও ভিটামিন 'সি' :--ইংল্যান্ডের অনেক চিকিৎসক পরীক্ষা করে দেখেছেন যে ভিটামিন 'সি' কোলেসট্রল নামের এক ধরণের রাসায়নিক উপাদান ভেঙ্গে দেয়, এর ফলে রক্তে কোলেসট্রলের পরিমাণ নিয়ন্ত্রনে রাখা সম্ভব। এই ভিটামিন ধমনীর মধ্যে স্নেহজাতীয় পদার্থ জমতে দেয় না, ফলে ধমনীগুলোতে রক্ত চলাচল নিয়মিত থাকে। আমেরিকার ডাক্তাররা অবশ্য মনে করেন, ইংল্যান্ডের ডাক্তারদের মতামত যথার্থ বলে মেনে নেয়ার পক্ষে প্রচুর উদাহরণ নেই।

৩) রক্তশূন্যতার প্রতিষেধক ঃ ২৫ মিলিগ্রাম ভিটামিন 'সি' নারীদেহে রক্তে লোহার পরিমাণ বাড়াবার ক্ষেত্রে সহায়ক হয়। ভিটামিন 'সি' খাদ্যের মধ্যে লোহা রক্তে ধারণের ক্ষেত্রে সহায়ক। ৫০০ মিলিগ্রামের বেশি পরিমানের ভিটামিন 'সি' রক্ত শূন্যতার ক্ষেত্রে ঝুকিপূর্ন হতে পারে।

৪) ক্যান্সারের প্রতিষেধক ঃ- ১৯৮৩ সালে ব্যাপকভাবে খাদ্য ও ক্যান্সার বিষয়ের উপর অনুসন্ধানের মুল্যায়ন করে ইংল্যান্ডের ন্যাশনাল রিসার্স কাউন্সিল (এন আর সি) সিদ্ধান্তে আসে যে, ভিটামিন 'সি' ভিটামিন 'এ' ও মেলিনিয়াম নামক ধাতবের যৌথ ব্যবহার ক্যান্সার প্রতিরোধে সমর্থ। জনগণের মধ্যে অনুসন্ধান চালিয়ে দেখা গেছে যারা খাদ্যে নিয়মিত ভিটামিন 'সি' গ্রহণ করে থাকেন তাদের মধ্যে মুখ, কণ্ঠনালী ও পাকস্থলীর ক্যান্সারের সংখ্যা অনেক কম। নিউ ইয়র্কে একটি চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ে রোগীদের মধ্যে অনুসন্ধান চালিয়ে দেখা গেছে যে যারা কম পরিমাণে ভিটামিন 'সি' নিয়মিত সেবন করে তেমন মহিলাদের জরায়ুর ফুলের ক্যান্সারের সংখ্যা কম।

আমেরিকাতে অনুসন্ধান করে দেখা গেছে যে ভিটামিন 'সি' মানব দেহে নাইমোঅ্যামাইন নামক একটি বিপজ্জনক রাসায়নিক দ্রব্যের উৎপাদন কমিয়ে ফেলে, নাইট্রেট মিশ্রিত খাদ্য গ্রহণ করলে এই সমস্যা অর্থাৎ নাইট্রোসেগাসাইন রাসায়নিক দ্রব্যে দেহে বর্দ্ধিত হারে তৈরি হয়। আমেরিকাতে বর্তমানে যে সব খাদ্যে নাইট্রেট দেয়া হয়, সে সব খাদ্য ভিটামিন 'সি'-ও দেয়া হয়। সমকালীন পরিসংখ্যানে দেখা গেছে বর্তমানে পাকস্থলীর ক্যান্সারের সংখ্যা কমে গেছে। কিন্তু এমন কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি যে ভিটামিন 'সি' ক্যান্সার নিরাময়ের কাজ করতে পারে।

৫) অন্যান্য ক্ষেত্রে ঃ--সমকালীন দু'টি গবেষনা প্রমাণ করেছে যে ভিটামিন 'সি' হারপিস, দীর্ঘদিন বিছানায় শুয়ে থাকলে যে ঘা হয়, তার প্রতিষেধক হিসেবে একটি উৎকৃষ্ট উপাদান। এ ছাড়া হাড়ের কিছু রোগ ও দেহের প্রতিরক্ষা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে ভিটামিন 'সি' এর ভূমিকা নিয়ে প্রচুর গবেষণা চলছে।

ঢাকা গভর্নমেন্ট মুসলিম হাই স্কুল বার্ষিকী

কোন খাদ্যে কি পরিমান ভিটামিন আছে ঃ সাধারণত ঃ কমলালেবু, বাতাবিলেবু, টাটকা শাকসবজি, তরিতরকারি, টমেটো, আনারস, চালতা, কদবেল, আমলকি, জলপাই, গাজর বিভিন্ন খাদ্যে প্রচুর পরিমানে ভিটামিন 'সি' পাওয়া যায়। নিম্নে একটি তালিকা দেওয়া হল ঃ—

কাচা খাদ্য	পরিমাণ	মিলিগ্রাম
কমলালেবু কদবেল, চালতা	একটা	৬৮
জাম্বুরা, বাতাবীলেবু, আমলকি, জলপাই	একটা	১০০-১২০
লটকো	১ কাপ	১০০-১৫০
লেবু	একটা	৬০ ৬৫
বাধা কপি, গাজর	১ কাপ	৪১
ফুলকপি	১ কাপ	৬৯
পালংশাক, পুঁইশাক	১ কাপ	৫০
আলু	৫ আউন্স	২৮
টমেটো	৭ ,,	৩৬

এছাড়া বর্তমানে বাজারে অত্যন্ত সস্তা দামে বিভিন্ন পরিমানের ভিটামিন 'সি' পাওয়া যায়। যেমন ঃ—সিভিট, সীমা-সি প্রভৃতি নামের ২৫০ মিলিগ্রাম ভিটামিন 'সি'- এর মূল্য '৫০ টাকা মাত্র। কিন্তু এগুলো কৃত্তিম উপায়ে তৈরী। এ জন্য বিভিন্ন কাচা খাদ্য দ্বারা ভিটামিন ,সি' গ্রহণ করাই উত্তম।

কি পরিমাণ ভিটামিন 'সি' সেবন করা উচিৎ--

সাধারণ খাদ্য তালিকায় ভিটামিন 'সি' থাকলে অবশ্যই বাড়তি ভিটামিন 'সি' -এর সেবন করার প্রয়োজন হয় না। ফলমূল, তরিতরকারী ইত্যাদি খাদ্যের মধ্য দিয়েই ভিটামিন 'সি' এর প্রয়োজনীয় পরিমাপ পাওয়া যেতে পারে। শুধু বিশেষ পরিস্থিতিতে এবং ডাক্তারের পরামর্শ অনুসারে অতিরিক্ত ভিটামিন 'সি, গ্রহন করা উচিৎ।

বিশেষজ্ঞরা মনে করেন যে, সুস্থ দেহে কখনই ২৫০ মিলিগ্রামের বেশী ভিটামিন 'সি' নিয়মিত গ্রহণ করা উচিৎ নয়। প্রত্যেকের উচিৎ বিশেষ পরিস্থিতিতে ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী ভিটামিন 'সি' গ্রহন করা।

ঢাকা গভর্নমেন্ট মুসলিম হাই স্কুল/বার্ষিকী

বহুদিন ধরে ভিটামিন 'সি' নিয়ে প্রচন্ড বিতর্ক চলে আসছে। ভিটামিন 'সি' এর পক্ষের লোকেরা দাবি করছেন যে, বড় আকারের 'ডোজ' বহু রোগ নিরাময় এবং স্বাস্থ্যরক্ষার ক্ষেত্রে প্রতিরোধমূলক কাজ করে থাকে। অন্যদের মতে প্রতিদিন ৬০ মিলিগ্রামের বেশী ভিটামিন 'সি' গ্রহণ করা অপচয় ছাড়া আর কিছুই নয়। এর চূড়ান্ত সমাধানের জন্য অনেক অনুসন্ধান প্রয়োজন। বিজ্ঞানীরা ভাবছেন যে এটা কোন কঠিন কাজ নয়। তারা ইতিমধ্যে কিছু পরীক্ষা মূলক সিদ্ধান্ত নিয়েছেন কিভাবে এই ভিটামিন মানব দেহের কোন প্রকারের কাজে লাগে। ইতিমধ্যে এ বিষয়ে কিছু ফলাফল, উল্লেখিত ভিটামিন 'সি' আমাদের কি উপকারে আসে, এর মধ্যে দেওয়া হয়েছে। ভিটামিন 'সি' বিশেষ করে দাঁতের মাড়ির রোগ প্রতিরোধে সহয়তা করে। তবে এখন পর্যন্ত কি পরিমাণ এই ভিটামিন সেবন করলে মাড়ির রোগ প্রতিরোধ হয় তা জানা যায় নি।

★ তথ্য নির্দেশক —সাপ্তাহিক আগামী, ৩২ তম সংখ্যা।

— o —

★ যার চরিত্রে আমানতদ্বারী বা বিশ্বস্ততা নেই, তার ঈমান নেই।

(মুসনাদে আহমদ)

নওবেলালা/৩২

প্রসঙ্গ ঃ ক্যান্সার

মীর মোঃ জয়নাল আবেদীন
দশম শ্রেণী, খ শাখা, বিজ্ঞান বিভাগ
রোল নং—২

ক্যান্সার শব্দের উৎপত্তি ঃ— ক্যান্সার শব্দটি এসেছে ল্যাটিন শব্দ ক্যানক্রাম থেকে। যার অর্থ কর্কট বা কাঁকড়া। ক্যান্সার এর এ রকম নামকরনের কারণ হলো এটি যে স্থানে আশ্রয় নেয় সে স্থানকে এটি ধরে রাখে অবিচল। এটি দুর্দ্দম্য। একে ছাড়ানো যায় না। ঠিক কাঁকড়ার মত।

ঐতিহাসিক পটভূমি ঃ— ক্যান্সার একটি প্রাচীন রোগ। জানা গেছে : আদিম মানুষেরও ক্যান্সার হতো। কিন্তু তখন একে চিহ্নিত করা হতো রহস্যজনক রোগ হিসেবে। ব্রিটিশ মিউজিয়ামে একটি ডাইনোসারের জীবাশ্মো লেজের অস্থিতে সুসংরক্ষিত অস্থির টিউমার আছে যা অন্তত ৮ কোটি বছরের পুরানো। ৪০০০ বছর আগে রচিত হিন্দু মহাকাব্য ও ধর্মগ্রন্থ রামায়নে সংহারী টিউমারের বর্ণনা আছে। (যাকে এখন ক্যান্সার বলা হয়)। ৭০০০ বছরের পুরানো প্রাচীন মিশরের মমিতে বিশেষ ধরনের অস্থির রোগের চিহ্ন পাওয়া গেছে। সম্ভবত এটি হয়েছিল টিউমারের জন্য। মিশরীয় প্যাপিরাসে (১৫০০ খ্রীঃ পূঃ) দেহের বিভিন্ন অংশে টিউমার হয়। ব্যাবিলনে নিনেভি লাইব্রেরীতে রক্ষিত উৎকীর্ন শিলালিপিতে স্তনের টিউমারের বর্ণনা আছে (৮০০ খ্রীঃ পূঃ)। প্রাচীন গ্রীক গ্রন্থেও টিউমারের উল্লেখ আছে।

ক্যান্সারের মুখোমুখি : বাংলাদেশ—ক্যান্সার ইনস্টিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক রহিমের কিছু তথ্য ঃ-

গত বিশ বছরে বাংলাদেশে ক্যান্সার রোগীর সংখ্যা প্রায় ১০ গুন বেড়েছে। অবশ্যই এটি হাসপাতাল ভিত্তিক তথ্য।

ক্যান্সারজনক এজেন্ট ঃ দেহের বাইরে একটি স্বাভাবিক কোষকে ক্যান্সার কোষে রূপান্তরিত করতে বিজ্ঞানীরা সক্ষম হয়েছেন। মানবেতর প্রাণীতে কৃত্রিম টিউমারও সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছেন। যে এজেন্টদের সাহায্যে তা করা গেছে ঃ এরা হলো রাসায়নিক পদার্থ, অনকোজেনিক ভাইরাস এবং বিকিরন শক্তি। অর্থাৎ এরাই দেহে ক্যান্সার ঘটায়।

দেহের বিভিন্ন অঙ্গের ক্যান্সারের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ

ফুসফুসে ক্যান্সার ঃ এটি হলো পুরুষদের সচরাচর ক্যান্সার। উন্নতদেশে ধুমপায়ী মহিলাদের সংখ্যা বাড়াতে মহিলাদেরও এ ক্যান্সার হয়।

এ ক্যান্সারটি প্রধানত পুরুষদের ক্যান্সার, যাদের বয়স ৬০ এর বেশী, তবে কম বয়সেও হতে পারে। এমন সব লোক যারা ২০ বছর ধরে দৈনিক ১/২ প্যাকেট সিগারেট খাচ্ছেন। খুব ছোট্ট বেলায় যদি সিগারেট ধরেন এমন সব লোকের ফুসফুসে ক্যান্সার হওয়ার সম্ভাবনা বেশী।

পেশাগত ঝুঁকিও ফুসফুসে ক্যান্সার ঘটাতে পারে। যে সব লোক এসবেসটস, ক্রোমিয়াম কোল-টার, ভিনাইল ক্লোরাইড, ইউরেনিয়াম কনা নিয়ে কাজ করেন, তাদের ফুসফুসে ক্যান্সার হওয়ার ঝুকি বেশী।

মুখ গহবরে ক্যান্সার ঃ পশ্চিমা দেশের পরিসংখ্যানে দেখা যায় ৪০ বছর বয়সের পর পুরুষদের এ ক্যান্সার বেশী হয়। মহিলাদের তুলনায় দ্বিগুন।

মুখ গহবরের ক্যান্সারের মধ্যে জিহবায় হয় ২০% ঠোঁটে ১৫% লালাগ্রন্হি ১০%। মুখ গহবরের অধিকাংশ ক্যান্সারের উৎস উপঝিল্লী কোষ থেকে।

বিভিন্ন গবেষনা থেকে দেখা গেছে ঃ যারা তামাক ও পান সুপারী চিবান এবং যাদের জর্দা ও খৈনী খাওয়ার অভ্যাস তাদের মুখ গহবরের ক্যান্সার হয় বেশী।

মুখ গহবরে ক্যান্সার হওয়ার সবচেয়ে সচরাচর পূর্ব লক্ষণ হল ঃ একটি ক্ষত যা শুকাচ্ছেনা এবং সহজেই এ থেকে রক্ত ক্ষরন হচ্ছে।

স্বরযন্ত্রের ক্যান্সার ঃ যারা খুব বেশী ধূমপান অথবা মদ পান করেন তাদের এই ক্যান্সার বেশী হয়।

গায়ক, অভিনেতা ও জননেতারা প্রায়ই এই ক্যান্সারের শিকার হন এর মূলে রয়েছে অনর্গল কথা বলা বা গান করার জন্য স্বরযন্ত্রের উপর অর্থাৎ স্বরযন্ত্রের অত্যাধিক ব্যবহার।

এই ক্যান্সার এর একটি প্রধান লক্ষণ হলো ঃ অচল স্থায়ী স্বরভঙ্গ যা ক্রমান্বয়ে বাড়তে থাকে।

ত্বক ক্যান্সার ঃ ত্বকের ক্যান্সার একটি সচরাচর ক্যান্সার। অন্ততঃ পাশ্চাত্য দেশে। তবে এই ধরনের ক্যান্সার নিরাময়ের হার ও খুব বেশী।

বার বার দীর্ঘ সময় ধরে সূর্যের অতি বেগুনী রশ্মির সম্মুখীন যদি কেউ হয়, তাহলে তার ত্বক ক্যান্সার হওয়ার সম্ভাবনা খুব বেশী। সাঁতার কাটা, খেলাধূলা, মাছ ধরা, রিক্সা চালানো-এরকম কাজ যারা করে তাদের ত্বক ক্যান্সার হওয়ার সম্ভাবনা বেশী।

কালো ও বাদামী ত্বকের অধিকারী যারা তাঁদের ত্বকের ক্যান্সার হয় খুব কম। ত্বক রঞ্জক মেলানিনের জন্যই এই কালো বা বাদামী রং হয় ত্বকের। এই মেলানিনই ত্বককে সূর্যের অতি বেগুনী রশ্মি থেকে বাঁচাচ্ছে। যাদের রং ফর্সা তাদের ঝুঁকি বেশী।

ব্লাড ক্যান্সার ঃ ক্যান্সার সাধারণ দু'রকম। উপঝিল্লীতে যে ক্যান্সার হয়, তাকে বলে 'ক্যার্সনোমা'। আর সংযোজক কলায় যে টিউমার বা ক্যান্সার হয় একে বলে 'সার্কোমা'। এই সার্কোমা রক্ত উৎপাদী কলাতেও শুরু হতে পারে, যাকে প্রচলিত কথায় ব্লাড ক্যান্সার বলা হয়ে থাকে। (সংকলিত)

—×—

★ শ্রমজীবি স্বহস্তে কাজ করে, যাহা উপার্জন করে, উহাই শ্রেষ্ঠ উপার্জন, যখন সে আন্তরিকতার সাথে কাজ করে। (মুসনাদে আহমদ)।

নিরক্ষরতা দূরীকরণ

মোহাম্মদ আনছার শিকদার
সহকারী শিক্ষক

বাংলাদেশ একটি স্বাধীন ও উন্নয়নশীল রাষ্ট্র। ৫৫,৫৯৮ বর্গমাইলের এই দেশে প্রায় ১০ কোটি লোকের বাস। এই বিপুল জনগোষ্ঠির মাত্র শতকরা ২৪ ভাগ লোক শিক্ষিত। বাকী সবাই অশিক্ষিত বা নিরক্ষর।

নিরক্ষর বলতে বোঝায় যার অক্ষর জ্ঞান নাই। যার শিক্ষা নাই। ইউনেস্কোর সংজ্ঞানুসারে যে ব্যক্তি তার দৈনন্দিন জীবন সম্পর্কিত সহজ বিবরণ পড়ে বুঝতে পারে না ও লিখতে পারে না, সেই নিরক্ষর। সাধারণভাবে তাই মোটামুটি পড়তে ও লিখতে এবং গননা করতে না পারলেই তাকে নিরক্ষর বলে। বাংলাদেশে এই শ্রেণীর লোকের সংখ্যাই বেশী।

রাষ্ট্রের একটি বড় উপাদান জনগণ। জনগণের দ্বারাই হয় দেশের মঙ্গল, জাতীয় উন্নয়ন। কিন্তু জনগণ যদি অশিক্ষিত হয় তবে দেশের এই অমূল্য উপাদানই আবার সমস্যার সৃষ্টি করে —ফলে জাতীয় উন্নয়ন হয় ব্যাহত।

নিরক্ষরতা তাই জাতীর বড় শত্রু। জনমীতির সঙ্গে বাড়ছে এই নিরক্ষর মানুষের সংখ্যাও। ফলে জ্ঞানে বিজ্ঞানে, আধুনিক কৃষি ব্যবস্থায়, বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি ইত্যাদিতে দেশ ও জাতি যতই উন্নত হোক না কেন ব্যাহত হবে তার—জাতীয় উন্নয়ন, কেননা নিরক্ষর মানুষের অজ্ঞানতার জন্যই তা যথাযথ রূপ লাভ করতে পারবে না।

তাই দেশ গড়ার জন্য প্রয়োজন নিরক্ষরকে শিক্ষা দেওয়া। শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড আর নিরক্ষরতা জাতির অভিশাপ। আলো আর অন্ধকারের যেমন সম্পর্ক, শিক্ষা ও নিরক্ষরতার মধ্যেও সেইরূপ সম্পর্ক। শিক্ষিত ব্যক্তি সমাজকে করে আলোকিত ও উন্নত আর নিরক্ষর অশিক্ষিত ব্যক্তি সমাজকে করে পঙ্গু ও অভিশপ্ত। ফলে সুন্দর ও সুখী জীবনের অবদান থেকে দেশ ও জাতি হয় বঞ্চিত। নিরক্ষরতা শুধু জাতির জন্যই নয় ব্যক্তিগত জীবনের জন্য, মানবতার জন্য সমাজের জন্যও অভিশাপ। এই অভিশাপ মুক্ত হতে হলে চাই শিক্ষা। শিক্ষা হল জ্ঞান রাজ্যে প্রবেশের চাবিকাঠি। এই জ্ঞান রাজ্যে প্রবেশের দুটো পথ। একটি বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা অপরটি সর্বজনীন বয়স্ক শিক্ষা। একটি প্রতিরোধক ও অপরটি প্রতিষেধক। কলেরা-বসন্ত ইত্যাতি মারাত্মক ব্যাধি থেকে মুক্ত থাকার জন্য যেমন প্রয়োজন প্রতিরোধক ব্যবস্থা গ্রহন করা। তেমনি জাতির নিরক্ষরতা নামক অভিশাপে নিমজ্জিত হওয়ার আগেই উচিত প্রতিরোধক ব্যবস্থা হিসাবে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করা।

কিন্তু বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়নশীল দেশের জন্য একটি বিরাট সমস্যা। উন্নয়নশীল দেশ তুলনামূলকভাবে উন্নত দেশ অপেক্ষা অনেক দরিদ্র। তাই দরিদ্র মা, বাবা তাদের সন্তানদের স্কুলে পাঠানোর চাইতে ক্ষেতে খামারে নিয়োগ করানোই বেশী প্রয়োজন মনে করে—কারণ এই শিশু শ্রমে যে রোজগার হয় তাই তাদের জীবনে সম্বল মনে করে। তাই বাধ্যতামূলক শিক্ষা আমাদের দেশে হচ্ছে না। এছাড়া স্কুলের খরচ চালানোও অনেকের পক্ষে সম্ভব হয় না। সুতরাং সন্তানদের চেয়ে যদি তাদের বাবা মাকে স্বাক্ষর জ্ঞানে শিক্ষিত করা যায় তাহলে তারা শিক্ষার মর্ম উপলব্ধি করে তাদের সন্তানদের উপার্জনশীল শ্রমে নিয়োগ না করে শিক্ষার জন্য স্কুলে পাঠাবেন।

অতএব দ্বিতীয় পর্যায়ে যে সর্বজনীন বয়স্ক শিক্ষার কথা বলা হয়েছে তারই প্রয়োজন আগে। অসুখ হলে ঔষধ খেতে হয়। বাংলাদেশের বিপুল জনগোষ্ঠি অশিক্ষা বা নিরক্ষরতার ব্যাধিতে আক্রান্ত। এই ব্যাধি থেকে মুক্তি পেতে চাইলে ঔষধ হিসাবে প্রয়োজন শিক্ষার তথা বয়স্ক শিক্ষার।

বাংলাদেশ এখন উন্নয়নের পথে—তাই চাই পরিবর্তন। বয়স্করাই দেশ, সমাজ ও জাতির প্রতিভূ। কৃষ্টি, সভ্যতার ধারাবাহক, সঞ্জীবক ভবিষ্যত সমাজের বুনিয়াদ প্রতিষ্ঠাতা। তাই দেশের জন্য প্রয়োজন শিক্ষিত বয়স্ক লোকের।

নিরক্ষর পিতা মাতা শিক্ষার মূল্য বোঝেনা বলেই তারা সন্তান স্কুলে পাঠায় না। পক্ষান্তরে যত অল্প শিক্ষিতই হোক না কেন শিক্ষিত মা বাবাই সন্তানদের শিক্ষা দিতে চেষ্টা করেন—পরিসংখ্যানে দেখা গেছে যেখানে বয়স্ক শিক্ষার প্রসার ঘটানো হয়েছে সেখানেই মা বাবারা স্বাক্ষর হওয়ার সাথে সাথে নিজেরা পড়া লেখা শুরু করেছে এবং সন্তানদের নিজেরাই পড়ানো শুরু করেছে এবং স্কুলে পাঠিয়েছে। এক্ষেত্রে বয়স্ক মেয়েরা বেশী কৃতিত্ব দেখাচ্ছে। নিরক্ষর বয়স্কদের ব্যবহারিক—লিখন পঠন শেখানোর প্রাথমিক পর্যায় শেষ হলেই অবিরামভাবে শিক্ষার ব্যবস্থা রাখতে হবে এবং বাড়ী স্কুল ও সমাজ পর্যায়ে সমভাবে শিক্ষিত করতে হবে।

'চোখ থাকতে অন্ধ' এ কথাটির তাৎপর্য নিরক্ষরদের বোঝাতে হবে। দুনিয়া পরিবর্তনশীল। সংবাদপত্র, রেডিও, টিভির মাধ্যমে দুনিয়ার অনেক খবর মুহূর্তের মধ্যে পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ছে। সংবাদপত্রের মাধ্যমেই এই খবর ছড়াচ্ছে তাই এগুলোর পড়ার অভ্যাস-পড়ার সুব্যবস্থা করতে পারলে ভাল হবে। ধৈর্যের অনুশীলন, আর্থিক উন্নয়নের বই সংসার জীবনের কথা, কৃষি ব্যবস্থার কথা ইত্যাদি বই পড়ার ও ব্যবস্থা করতে হবে। কারণ পড়লে মানুষের মনের উদারতা বাড়ে, নৈতিকতা বোধ জন্মে, আবার অর্থ সমাগমেরও ব্যবস্থা হয় এই গুলিই শিক্ষার দান।

সরকারী পর্যায়ে নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্য, নানা রকম পুস্তিকা, প্রচার-পত্র, বিনা পয়সায় বিতরন করা হচ্ছে, স্বাক্ষরতা দিবস পালন করা হচ্ছে কিন্তু যাদের জন্য এত আয়োজন তারা নিরক্ষর থাকায় এই সমস্ত প্রচার পত্র, পুস্তিকা তাদের কাছে মূল্যহীন হয়ে যায়। সেমিনারের মূল্যবান কথা তাদের মনে দাগ কাটতে পারে না। ধর্মীয় নেতাদেরও এদের আলোচনায় নিরক্ষরতার ভয়াবহতা সম্পর্কে সচেতন করা দরকার--কারণ আমাদের দেশের অধিকাংশ লোক নিরক্ষর ও ধর্মে বিশ্বাসী, তাদের চেতনায় নিরক্ষরতার কুফল তুলে ধরতে পারলেই দেশ ও দশের উপকার। নতুবা বিংশ শতাব্দীর এই বিজ্ঞান নির্ভর যুগেও নিরক্ষরতার অভিশাপে জর্জরিত শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত এই—বিপুল জনশক্তি দেশের সমাজ, সভ্যতা, অর্থনীতি, রাজনীতি, সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রতিটি ক্ষেত্রে অগ্রগতি ও প্রগতির পথে বিরাট বাঁধা ও হুমকি হয়ে থাকবে।

— o —

* পাপী ছাড়া অন্য কেহই নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি দুষ্পাপ্যতার সময় (অতি মুনাফার জন্য) গুদামজাত করে না। (মুসলিম)

আজব চিকিৎসা

—মোঃ মঈনুল ইসলাম
৮ম শ্রেণী, "খ" শাখা
রোল নং ৭৫

সর্ব কালের সর্ব শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক ইবনে সিনার নাম নিশ্চয় সবার জানা। তার চিকিৎসা কৌশল ছিল বেশ বৈচিত্র পূর্ণ। নিম্নে তার চিকিৎসা সম্পর্কীয় একটি মজার ঘটনা বর্ননা করা হল। এ থেকে তার আজব চিকিৎসা সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যাবে।

তৎকালীন ইস্পাহানের শাহজাদার একটি অদ্ভুত রোগ দেখা দিল। সে খাওয়া দাওয়া করতে পছন্দ করত না। সে শুধু দিন রাত চিৎকার করে বলত ঃ আমি গরু, আমাকে জবাই করো, আমার গোশত দিয়ে মজাদার কাবাব বানাও। তার এই অদ্ভুত রোগের চিকিৎসার জন্য অনেক বড় বড় হেকিম চেষ্টা করল, কিন্তু সবাই বিদায় হল। এ দিকে শাহজাদার রোগ দিন দিন বেড়েই চলল। সে খাওয়া দাওয়া পুরোপুরি ছেড়ে দিল। এমন কি ঔষুধ পর্যন্ত মুখে দিত না এবং সবাইকে বলল ঃ তার কোন রোগ হয়নি। সে শুধু চাইত তাকে জবাই করা হোক।

শাহজাদার এই অদ্ভুত রোগে সবাই চিন্তিত হয়ে পড়ল। না খেয়ে খেয়ে সে প্রায় আধমরা হয়ে গেল, সে চীৎকার করে আবোল তাবোল বকতেই থাকত। অবশেষে উপায়ান্ত না দেখে সবাই ইবনে সিনার শরনাপন্ন হল। তিনি লোক মুখে বিস্তারিত শুনে বললেন ঃ শাহজাদাকে খুশির খবর দাও যে, তাকে জবাই করার জন্য কসাই আসছে।

শাহজাদার কানে এ সংবাদ পৌঁছল। খবর শুনে ত শাহজাদা মহা খুশি। কিছুক্ষন পর ইবনে সিনা শাহজাদার কাছে হাজির হলেন। তার হাতে খুব ধারালো ছুরি ছিল। ছুরি দেখে সবাই ঘাবরে গেল।

সবাই শংকিত হল এই ভেবে যে, সত্যিই কি ইবনে সিনা শাহজাদাকে জবাই করবেন!

ইবনে সিনা দু'জন স্বাস্থ্যবান লোককে হুকুম করলেন শাহজাদাকে ধরে শোয়ানোর জন্য। এই কথা শুনে শাহজাদা স্বতঃফুর্ত ভাবে শুয়ে পড়ল।

তখন ইবনে সিনা ছুরি হাতে নিয়ে "বিসমিল্লাহ" বলে শাহজাদার গলায় ছুরি ধরলেন এবং বা হাতটা তার বুকের ওপড় রাখলেন। এমন সময় হঠাৎ ঘৃনা ভরে তিনি মুখ ফিরিয়ে নিলেন। বললেন ঃ নাহ্ গরুটা শুকিয়ে গেছে! এর গোশত দিয়ে কিছুতেই কাবাব হবেনা। একে কিছু

দিন ভাল করে খাইয়ে মোটা তাজা করতে হবে। তখন জবাই করে ভাল গোশত পাওয়া যাবে। তা দিয়ে ভাল কাবাব ও হবে।

কসাই এর কথা শুনে শাহজাদার মন খারাপ হয়ে গেল। ভাবল, মোটা তাজা না হওয়া পর্যন্ত তাকে আর জবাই করা হবে না। তার পর কসাই এর কথামত শাহজাদা ভাল মত খাবার খেতে শুরু করল। এ ভাবে দিন দিন সে বেশ নাদুস নুদুস হয়ে উঠল। এ দিকে কসাই রূপী ইবনে সিনা শাহজাদার দৈনিক খাদ্যের সাথে দাওয়াই দিতে লাগলেন। এর ফলে অল্প দিনের মধ্যেই শাহ জাদার শরীর বেশ ভাল হয়ে গেল। তার মনের রোগও চলে গেল। সে কিছুতেই আর জবাই হতে চাইল না। বাদশাহ ইবনে সিনার উপর খুবই খুশি হলেন। তার চিকিৎসা পদ্ধতি দেখে অবাক হয়ে গেলেন।

সত্যিই ভাবতে অবাক লাগে এত বছর আগে ইবনে সিনার এই বিস্ময়কর মনো চিকিৎসার কথা ভেবে তার বিস্ময়কর ও যথার্থ চিকিৎসার কারণে আজ মৃত্যুর বহু বছর পরেও জগৎ জোড়া তিনি সর্ব কালের সর্ব শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক রূপে পরিচিত।

—o—

★ মাতার পদতলে বেহেস্ত অবস্থিত। (আল কাযাই)

বাঁচানোর ফল

মোঃ খোন্দকার জাকারিয়া
৬ষ্ঠ শ্রেণী, খ শাখা, রোল—১০

—এক দেশে এক কৃষক বাস করত। সে ছিল খুবই গরীব। সে সকালে চাষ করতে যেতো আর বিকালে বাড়ী ফিরত। প্রতি দিনের মতো সে সকালে জমি চাষ করত গেল। সে জমি চাষ করতে করতে হঠাৎ তার লাঙলটা কিসে যেন আটকে গেল। লাঙলটা কিসে আটকালো তা দেখার জন্য সে মাটি গর্ত করতে লাগলো। সে দেখল একটা কলসির আগায় লাঙলটি আটকে গিয়েছিল। সে তখন মাটি গর্ত করে কলসিটি তুলে দেখে, কলসিটির মুখটি আটকানো। সে ভাবলো, কলসির ভিতর কোন টাকা পয়সা আছে। তাই মনে করে সে কলসির মুখটি খুললো সাথে সাথে কলসি থেকে একটি দৈত্য বের হয়ে আসলো। কৃষক দৈত্যটি দেখে ভীষন ভয় পেয়ে গেল। এবং দৈত্যর কাছে তাকে না খাওয়ার জন্য অনুরোধ করতে লাগলো। তখন দৈত্যটি বলতে লাগলো, "আমি তোমাকে খাবো না। তুমি আমার জীবন বাঁচিয়েছো। আমি হোলাম দৈত্যর রাজা। তুমি আমার কাছে কি চাও। আমি তোমাকে তাই দেব।" কৃষকটি কিন্তু দৈত্যের কথা বিশ্বাস করল না। সে বল্লো, "আমাকে মেরো না; দৈত্য তখন বল্লো," আচ্ছা আমি তোমাকে এই লাঠিটা দিলাম এর মধ্যে ফুঁ দিলে শুধু মিষ্টি আর মিষ্টি পাবে। আর এই হলো আমার চুল, এই চুল পোড়ালে আমি তোমার কাছে এসে যাবো। এই বলে দৈত্যটি অদৃশ হয়ে গেল। কৃষক নাচতে নাচতে বাড়ি গিয়ে একটা মিষ্টির দোকান খুলে বসলো। লাঠির মধ্যে ফুঁ দিতেই সাথে সাথে লাঠির মধ্য দিয়ে বেরিয়ে এলো শুধু মিষ্টি আর মিষ্টি। আর সেই মিষ্টি এমনি মজা যা খেতে দূর দূর থেকে মানুষ এসে হাঁড়িতে হাঁড়িতে ভরে ভরে মিষ্টি নিতে থাকলো। কৃষকের মিষ্টির ব্যবসা জমজমাট। তার একটা বাড়ির জায়গায় তিনটে দালান। ঘরতো না যেন রাজার মহল।

সেই গ্রামে এক দুষ্ট লোক ছিল। সে ভাবলো মিষ্টি বানাতে লোকজন লাগে কিন্তু কৃষক যে মিষ্টি বিক্রি করে কোন লোকজন বানায় না। নিজেও বানায় না। ব্যাপার কি? তাই সে একদিন কৃষকের বাড়ির জানালা দিয়ে দেখে, কৃষক একটা লাঠির মধ্যে ফু দিতেই হর হর করে মিষ্টি বের হয়ে আসলো। তার মাথায় একটা দুষ্ট বুদ্ধি বের হলো, লাঠিটি নেবার জন্যে। একদিন দুষ্ট লোক কৃষকের বাড়ি এসে বল্লো, দেখ আজ আমার মেয়ের বিয়ে অনেক মিষ্টি লাগবে। তা এতো মিষ্টি এখান থেকে নিয়ে আমার বাসায় নেওয়া সম্ভব না। তাই বলছিলাম তোমার মিষ্টির লাঠিটা যদি নিয়ে আমার বাড়িতে মিষ্টি তৈরি করতে, তাহলে ভালো হতো। তখন কৃষক বল্লো তুমি আমার লাঠির কথা জানলে কি করে। তখন দুষ্ট লোক বল্লো, আমি তোমার বাড়ির জানালা দিয়ে দেখেছি। তুমি

তোমার মিষ্টির লাঠি নিয়ে এসো আমি যাচ্ছি। কৃষক আর কি করে, বিয়ে বাড়ি যেতে যেতে দুষ্ট লোকটি তাকে একটা ঘরে ভিতর নিয়ে গেল এবং আরো কিছু লোক নিয়ে তাকে মেরে তার কাছ থেকে মিষ্টির লাঠিটি নিয়ে গেল। কৃষক তখন দৌড়ে বাড়ীতে গিয়ে দৈত্যর চুল পোড়া দিল। আর সাথে সাথে দৈত্য সহ তার সাথে আরও দৈত্য আসলো। তখন কৃষক দৈত্যকে সব বল্লো এবং বল্লো, "বিয়ে বাড়ির কাউ কেও মেরে ফেলো না। দৈত্যরা বিয়ের বাড়ি গিয়ে সবাইকে দমাদম পিটালো। দৈত্যদের সাথে ও কিছু মেয়ে দৈত্য এসেছিল তারও মেয়েদের কে দমাদম পিটালো। তখন দুষ্ট লোকটা দৌড়ে পালিয়ে যাচ্ছিল। দৈত্য রাজাটা তাকে ধরে দমাদম পিটালো। কৃষক যখন আসলো। দুষ্ট লোকটা তার পায়ে পড়ে বল্লো," এই যে আপনার লাঠি। আমাকে পিটাতে বারন করুন। ওরে বাবা-রে গেলাম-রে ওরে বাবা-রে। কৃষক দৈত্যদের পিটাতে মানা করল। তখন দৈত্যর রাজা তাকে আরেকটি চুল দিয়ে চলে গেল। কৃষকের আর কোন শত্রু রইল না। সে মনের সুখে মিষ্টি বিক্রি করতে লাগলো।

—*—

★ তোমরা তোমাদের প্রতি পালকের দেওয়া রিযিক উপভোগ কর এবং এর জন্য তার শোকর আদায় কর। (আল-কোরআন)।

দুই ভাই (গল্প)

মোঃ ফজলুল করিম খাঁন
দশম শ্রেণী 'খ' শাখা

ফরিদ আর শহীদ দুই ভাই। ফরিদ বিছানায় চার মাস ধরে পড়ে আছে। শুয়ে শুয়ে সে দেখে সকালের সূর্যের আলো, মধ্যাহ্নের তীক্ষ্ম রোদ বিকালের সূর্য ও রাতের কালো অন্ধকার। বিকেলে শুয়ে শুয়ে সে ওর ভাই ও তার বন্ধুরা খেলা করছে, তার খুব খারাপ লাগে। ও ভাবে তো আমিও খেলা করতাম ওর মনে পড়ে যায় সে দিনের সেই ঘটানা।

সে দিন ছিল শুক্রবার। স্কুল বন্ধ ছিল। বন্ধুরা তাদের সাথে খেলার জন্য ফরিদ ও শহীদকে ডাকতে আসে। তারা খুব তাড়াতাড়ি করে বাড়ীর কাজ সেরে অংক করে খেলতে যায়। বল খেলতে গিয়ে হঠাৎ ফরিদ পড়ে যায় মাটিতে। সবাই ধরাধরি করে নিয়ে আসে বাড়ীতে। সেদিন তার বাবা বাইরে গিয়েছিল বিশেষ কাজে। ডাক্তার আ.স কাছে থেকেই। সে তাকে দেখার পর জিজ্ঞেস করল এর আগে কখনো এমন হয়েছিল কি? তখন তার ছোট ভাই শহীদ বলে উঠল যে, সে স্কুলে এমন ভাবে দু'বার পড়ে গিয়েছিল। তোমার আম্মাকে বলোনি কেন? তখন সে বললো ঔষুধ খেতে হবে যে, তাই? ডাক্তার চলে গেল। বাবা এসে সব শুনলো। আজ ফরিদের রিপোর্ট দিবার কথা। তার বাবা তাড়াতাড়ি করে অফিস থেকে ডাক্তারের কাছে গেল। ডাক্তার তাকে দেখে বললো "আসুন সোবহান সাহেব।" সোবহান সাহেব বললেন রিপোর্ট এ কি দেখলেন? ডাক্তার বললো সোবহান সাহেব, রিপোর্ট পেয়ে আপনি মন খারাপ করবেন না যা সত্য তা মেনে নিতেই হবে। সোবাহান সাহেব বললেন কি হয়েছে আমাকে সব খুলে বলুন। এখন আর উপায় নেই, তার মাথায় ব্রেইনে ... ...

কি হয়েছেঃ ওর ব্রেইনে? মুখ কালো করে আছেন কেন আপনি?

"মানে ওর ব্রেইনে ক্যান্সার হয়েছে!"

তার পর থেকেই বাড়িটা একেবারে চুপচাপ হয়ে আছে। কিন্তু ভাগ্যের পরিহাসে ফরিদ সবার কাছ থেকে চলে যাবে। এই নিষ্ঠুর ক্যান্সার মায়ের বুক খালি করে চলে যাবে। যাবে তার ছোট ভাইকে একা ফেলে। নিষ্ঠুর ক্যান্সার ফুটতে দিলনা ফরিদের-মত একটি নিষ্পাপ ফুলকে; দিল না তাকে বাঁচতে।

— x —

★ আল্লাহ তাআলা তোমাদিগকে সুবিচার এবং সৌজন্যের নির্দেশ দিয়েছেন।

(আল্ কুরআন)

ইসলামে পর্দা প্রথার গুরুত্ব

শামসুন নাহার বেগম
সহকারী প্রধান শিক্ষিকা

ইসলাম অর্থ আনুগত্য। ইসলাম ধর্মাবলম্বী আল্লাহ্‌র আনুগত্য স্বীকার করবে। এটাই স্বাভাবিক আল্লাহ্‌র হুকুম অক্ষরে অক্ষরে পালন করার মাধ্যমেই মহান রাব্বুল আল আমিনের আনুগত্য স্বীকার করা হয়। আমরা মুসলমান নরনারী আল্লাহ্‌র গোলাম। আল্লাহ রাব্বুল আল-আমিন আমাদের দুনিয়াতে পাঠিয়ে একটা জীবন বিধান দিয়েছেন সেটাই হল আল-কুরআন। হযরত মুহাম্মদ (দঃ) কুরআনের বিধান নিজের জীবনে অনুসরণ করে আমাদের সঠিক পথ প্রদর্শন করে গেছেন। আজ আমরা তথাকথিত মুসলমানগণ কুরআনকে বাদ দিয়ে নবীজীর আদর্শকে বাদ দিয়ে আমাদের চাল-চলনে, আশাকে-পোষাকে, খাওয়া-দাওয়ায়ে, আচার-অনুষ্ঠানে বিজাতীয় আদর্শ অনুসরণ করে, বর্বরতা ও অসভ্যতার দিকে এবং অমাবশ্যার সূচীভেদ্য অন্ধকারের দিকে তলিয়ে যাচ্ছি। আমরা ধর্ম থেকে যত দূরে সরে যাচ্ছি অজ্ঞতা, অন্ধকার, অশান্তি ও সর্বনাশের দিকে তত দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছি।

ইসলাম শান্তির বার্তাবহ। ইসলামের যে বিধানগুলো আমাদের ইহ-লৌকিক ও পরলৌকিক কল্যাণের জন্যই। ইসলামে যে বিধানগুলো অনুসরণ করার জন্য মহান রাব্বুল আল আমিন কুরআন ও হাদিসে নির্দেশ দিয়েছেন পর্দাপ্রথা তন্মধ্যে অন্যতম। পর্দাপ্রথা ইসলামের একটি বিশেষ অবদান। ইসলামী যুগের পূর্বে ইহার কোন ব্যবস্থা ছিলনা। ইহা ইসলামের অন্যতম সৌন্দর্য। অন্য কোন ধর্মে পর্দার এরূপ কোন ব্যবস্থা নেই।

পর্দা প্রথা লঙ্ঘন করার দরুন আমাদের জাতীয় জীবন অতি দ্রুত গতিতে নৈতিক অবক্ষয়ের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। এর বিষক্রীয়ায় সমাজ ক্ষত বিক্ষত। পাশ্চাত্য আদর্শে অনুপ্রানীত, ইংরেজী শিক্ষিত একদল নারী প্রগতির ধোয়া তোলে পর্দাকে অবরোধ প্রথা হিসাবে চিহ্নিত করেছে, এবং পর্দা নারী জাতির পরিপন্থি ও জ্ঞানার্জনের প্রতিবন্ধক বলে আখ্যায়িত করেছেন। পত্র পত্রিকা খুললে নারী জাতির এক করুণ অবস্থা আমাদের দৃষ্টি গোচর হয়। এর পিছনে বহু কারণ বিদ্যমান তবে পর্দা প্রথা লঙ্ঘন ও একটা কারণ। পোশাক পরার উদ্দেশ্য হল নিজকে যতটুকু সম্ভব ঢেকে রাখা। আমরা তা না করে পাতলা, মিহিন, শালীনতা বিবর্জিত কাপড় পরে যতদূর সম্ভব নিজের শরীরকে খোলা রেখে যেখানে সেখানে ঘুরে বেড়াই। শিক্ষা মানুষের পশুত্বকে দমিয়ে মনুষ্যত্বকে বিকশিত করে এবং তার চরিত্র সহজ, সুন্দর ও পবিত্র করে। আর আজ আমরা যতই ডিগ্রী লাভ করছি ততই আল্লাহ্‌ ও আল্লাহ্‌র রসূলের পথ থেকে দূরে সরে পড়ছি এবং আমাদের বেপর্দা বাড়ছে। রাষ্ট্র, জাতি, সমাজ ও পরিবারের উপর বেপর্দার যে ছোঁয়া লেগেছে তার পরিণাম অতি ভয়াবহ।

ঢাকা গভর্নমেন্ট মুসলিম হাই স্কুল/বার্ষিকী

দেশে বেপর্দার যে ঢেউ উঠেছে এর পিছনে কিছু কারণ বিদ্যমান আছে। নারীর দৈহিক গঠন, বুদ্ধিতে ও চরিত্রগত পার্থক্য সম্বন্ধে সঠিক জ্ঞানের অভাব, স্ত্রী পুরুষের কর্মক্ষেত্রের স্বাভাবিক বিভিন্নতার আবশ্যকতা অস্বীকার, পর্দা প্রথার উপকারীতা ও বেপর্দার অপকারিতা সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারনা, কুরআন ও হাদীসের প্রতি ঔদাশীন্য ও সন্দেহজনক মনোভাব, পাশ্চাত্তের অন্ধ অনুকরণ, তাছাড়া ভি, সি, আর এবং টি, ভিতে অশ্লীল ও কুরুচীপূর্ণ ছবি দেখে মহিলারা বেপর্দার দিকে দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে। কেহ কেহ এই ধারণা করে থাকেন মেয়েদের পর্দা, জাতীয় উন্নতির অন্তরায় স্বরূপ। কিন্তু মুসলিম জাতির সুবর্ন যুগে মুসলিম নারী বেপর্দায় জীবন যাপন করেছে ইতিহাসে তার প্রমাণ নেই বরং যে হেরেম পর্দার শ্রেষ্ঠ প্রতীক তা মুসলিম সভ্যতারই অবদান। হিন্দু সভ্যতার যুগে হিন্দু নারীগণ পর্দা ছেড়ে দিয়েছে, ইতিহাস এ কথাও বলে না। বরং তারা যে পর্দা প্রথার সমর্থক ছিল, বর্তমান হিন্দু নারীর বৈশিষ্ট্য পূর্ণ অবগুন্ঠন তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। আবার অনেকের ধারণা পর্দা— ত্যাগ করে ইউরোপ এতটা উন্নত হতে সক্ষম হয়েছে। মধ্যযুগে এবং এর কিছুদিন পর পর্যন্ত ও ইউরোপের নারীগণ যে পর্দাশীল ছিল বর্তমান মিশনারী সিষ্টারদের আজানুলম্বিত পোশাক তার প্রমাণ। পর্দা সম্পর্কে কুরআন হাদীসের ব্যাখ্যা হতে আমরা পর্দা প্রথার গুরুত্ব ও আবশ্যকতা অনুধাবন করতে পারি।

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ পাক বলেছেন —

"(নারীগন) তোমরা তোমাদের গৃহে অবস্থান করবে আর পূর্বের জাহেলী যুগের ন্যায় নিজেদের সাজিয়ে গুজিয়ে প্রকাশ্যে চলাফেরা করো না তোমরা নামায কায়েম করবে, যাকাত আদায় করবে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের অনুগত থাকবে।"

(সূরা আল আহযাব)

অপর এক আয়াতে আল্লাহ পাক ঘোষণা করেছেন- "হে নবী। আপনি আপনার বিবি গণকে, আপনার কন্যাগণকে এবং অন্যান্য মুসলমান নারীগণকে বলেছিল (কোন জরুরত বসতঃ যখন তাঁদের বাহিরে গমনাগমনের দরকার পড়ে, তখন ও যেন তাঁরা পর্দা লঙ্ঘন না করে এমন কি চেহারা ও যেন খোলা না রাখে) তাঁরা যেন চাদরে ঘোমটা দ্বারা উত্তমরূপে চেহারাকে আবৃত করে রাখেন।"

একদা মহানবী (সঃ) অন্তঃপুরে বসে আছেন, তাঁর দু'জন বিবি হযরত আয়শা ও হযরত উম্মে সালমা (রাঃ) কাছে ছিলেন। এমন সময় হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মক্তুম নামে একজন অন্ধ সাহাবী (রাঃ) নবীজীর কাছে আসতে চাইলেন। নবীজী সহ ধর্মীনীদ্বয়কে পর্দা করতে হুকুম দিলেন। তাঁরা আরয করলেন— ইনি তো অন্ধ। তাঁর থেকে পর্দা করার দরকার কি? নবীজী বললেন— তোমরাও কি অন্ধ। তোমরা কি তাঁকে দেখতে পাবে না।" উক্ত ঘটনা থেকে আমরা সহজেই উপলব্ধি করতে পারি পর্দার গুরুত্ব কতখানি। আর পর্দা প্রথা পালন করা কত জরুরী। সুতরাং নারীদের বে আব্রু হয়ে অবাধে অন্তঃপুরের বাহিরে যাতায়াত করা শরীআতের পরিপন্থী।

ঢাকা গভর্নমেন্ট মুসলিম হাই স্কুল/বার্ষিকী

পর্দা নারীর মানমর্যাদা, ইজ্জত-আবরু বৃদ্ধি করে, পর্দা নারীর ভূষন। নারী নিজেকে যত সংযত রাখবে ততই তার মান মর্যাদা বাড়বে বই কমবে না। জাতীয় উন্নতি কল্পে সকল কাজে মহিলারা অংশ গ্রহণ করতে পারে তাতে কোন বাধা নিষেধ নেই, তবে তা হতে হবে যথাযথ পর্দা প্রথা পালনের মাধ্যমে।

পুরুষের পক্ষে নারীর বিশেষ দায়িত্ব যথাযথ ভাবে পালন করা যেমন দুরূহ ব্যাপার তেমনি নারীর পক্ষে পুরুষের বিশেষ দায়িত্বের কঠোর ক্ষেত্রগুলো অঞ্জাম দেওয়া নিতান্তই অসম্ভব ব্যাপার। আর তা করতে যাওয়া আল্লাহর নির্ধারিত সীমা লংঘনেরই নামান্তর। এ প্রসঙ্গে সুরা তালাকে উল্লেখ আছে —

"যে ব্যক্তি খোদার নির্দেশিত সীমা লংঘন করে, সে নিজের উপর যুলুম করে থাকে।"

পরিশেষে, মা বোনদের কাছে আকুল আবেদন— আসুন আমরা পর্দা প্রথা পালনের মাধ্যমে ইহকাল ও পরকালের কল্যানের দিকে অগ্রসর হই। এতেই রয়েছে মুক্তি, এতেই রয়েছে শান্তির ফল্গুধারা।

* * *

★ কল্যানমুলক এবং আল্লাহর আনুগত্যমুলক কাজে তোমরা পরস্পরের সাহায্য সহায়তা করো এবং অকল্যান কর গোনাহ এবং খোদাদ্রোহিতায় তোমরা কাহারো সাহায্য করো না।
(সুরা আল মাইদাহ)

জানা-অজানা

খ· ম· সাইদুর রহমান শ্যামল
নবম শ্রেণী বিজ্ঞান বিভাগ

* ইংরেজ চিকিৎসাবিদ উইলিয়াম হারভে ১৬১৬ খৃষ্টাব্দে মানবদেহের রক্ত সঞ্চালন তথ্য আবিষ্কার করেন।
* ১৭৯২ খৃষ্টাব্দে প্রথম আকাশ থেকে প্যারাসুটের সাহায্যে নামবার উপায় আবিষ্কার হয়।
* পৃথিবীতে সর্ব প্রথম ঘড়ি নির্মিত হয় ৯৯০ খৃষ্টাব্দে। জারবার্ট নামক জনৈক ফরাসী সন্ন্যাসী এই পদ্ধতির প্রচলন করেন।
* ১৯১২ খৃষ্টাব্দে এমান্ডেসন দক্ষিন মেরু আবিষ্কার করেন।
* ১৮শ শতাব্দীর শেষভাগে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে পেট্রোল আবিষ্কৃত হয়।
* ১৬০৮ খৃষ্টাব্দে ওলোন্দাজ বৈজ্ঞানিক হ্যামলি পারশে প্রথম দূরবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কার করেন।
* বৃটেনের আলেকজান্ডার ফ্লেমিং ১৯২৮ সালে "পেনিসিলিন" আবিষ্কার করেন।
* ১৮৪০ খৃষ্টাব্দের ১লা মে থেকে ইংল্যান্ডে ডাক টিকেটের প্রচলন হয়।
* ১৯১২ খৃষ্টাব্দে প্যারিসে সর্ব প্রথম রঙীন বায়স্কোপের ছবি তৈরী হয়।
* আমেরিকার ইষ্টম্যান ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে ফটো ফিল্ম আবিষ্কার করেন।
* ফটোগ্রাফের আবিষ্কর্তা "টমাস আলভা এডিসন" আমেরিকার অধিবাসী।
* জার্মানীর গুটেনবার্গ ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে ধাতব ছাপার অক্ষর আবিষ্কার করেন।
* জার্মানীর জেনার ১৮৮৯ সালে বসন্তের টীকা আবিষ্কার করেন।
* বিজ্ঞানী লর্ড এডেমার সর্ব প্রথম পরীক্ষা করে জানান যে, পোকা মাকড় বা যে কোন পতঙ্গ একেবারে কালা, তবে তাদের অনুভতি শক্তি খুব প্রখর।
* ১৮২৫ খৃষ্টাব্দে সর্ব প্রথম কলের কাগজ তৈরী হয়।
* ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে প্রথম সাইকেলের আবিষ্কার হয়। ইহা আবিষ্কার করেন ম্যাকমিলান নামে একজন স্কটল্যান্ড বাসী লোক।
* ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে জন ডেলটন সর্ব প্রথম আনবিক থিউরী আবিষ্কার করেন।
* ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে উইলসন সোয়ান বৈদ্যুতিক বাল্‌ব আবিষ্কার করেন।

ঢাকা গভর্নমেন্ট মুসলিম হাইস্কুল/বার্ষিকী

* ১৬১০ খৃষ্টাব্দে গ্যালিলিও টেলিস্কোপ আবিস্কার করেন।
* ১৮৯৫ সালে উইলিয়াম জিমরগ্যান ভলিবল খেলা আবিষ্কার করেন।
* জার্মান চিকিৎসক হ্যানিম্যান অষ্টাদশ শতব্দীতে প্রথম হোমিও প্যাথিক চিকিৎসার প্রবর্তন করেন।
* গ্যাসের সাহায্যে বাতি জ্বালার পদ্ধা আবিস্কার করেন উইলিয়াম মার্ক।
* ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে আমেরিকাতে সর্ব প্রথম ঝরনা কলম বা Fountain pen আবিস্কৃত হয়।
* ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দের ৬ই অক্টোবর সর্ব প্রথম পর্দায় সিনেমার ছবি দেখানো হয়, সেই ফিল্ম খানি ছিল মাত্র পঞ্চাশ ফুট, আর দেখতে এক মিনিটেরও কম সময় লাগত।

—০—

* পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহার করো এবং নিকট আত্মীয়দের প্রতিও। (আল কুরআন)

মোঃ আমির হোসেন
দশম শ্রেণী রোল নং—১৩

* সে ব্যক্তিই খাঁটি মুসলমান যার জিহ্‌বা ও হাত দ্বারা মুসলমান আঘাত পায় না। (আল-হাদীস)
* দান সদ্‌কা আল্লাহর রাগকে দূরীভূত করে এবং খারাপ মৃত্যু হইতে রক্ষা করে (আল-হাদীস)
* পিতার স্নেহ অপেক্ষা শিক্ষকের কঠোরতা ভাল (শেখ সাদী)
* শৈশবে ভদ্রতা না শিখিলে পরিণত বয়সে মহত্ত্ব লাভ করা যায় না (শেখ-সাদী)
* তিনটি বস্তু মানুষকে ধ্বংস করে দেয়-লোভ, হিংসা ও অহঙ্কার (ইমাম-গাজ্জলী (রাঃ)

* কারো সাথে তাড়াতাড়ি মহব্বত করো না এবং কারো সাথে শীঘ্রই দুশমনী করো না (হযরত আব্দুল কাদের জিলানী)
* বোবাদের হৃদয় তাদের মুখের মধ্যে থাকে, আর জ্ঞানীদের মুখ থাকে তাদের অন্তরে (ফ্রাঙ্কলিন)
* অসত্যের দাপট ক্ষণস্থায়ী কিন্তু সত্যের গৌরব চিরস্থায়ী (হযরত-লোকমান)
* যে ছাত্র শিক্ষকের শাসন মানে না, কালের শাসন তাকে অবশ্যই মানতে হবে (ইমাম-গাজ্জলী (রঃ)
* শিক্ষার আর অভিজ্ঞতার সংমিশ্রণেই জীবনে পরিপূর্ণতা আসে
* লালসা তোমার অন্তরে ঠাঁই দিওনা, কেননা তোমার শক্তি অন্যের চাইতে বেশি নয় (এরিস্টটল)
* প্রথমে আদেশ মানতে শিখো, পরে অন্যকে আদেশ করতে পারবে (নেপোলিয়ান বোনাপার্ট)

—০—

★ আল্লাহ পাকের দু'টি নিয়ামত রয়েছে, যে গুলোকে অনেক লোকই অবহেলা করে বিনষ্ট করে ঃ তন্মধ্যে একটি হচ্ছে 'স্বাস্থ্য' আর অপরটি হচ্ছে অবসর (হাদীস)

ঃ ছড়া ও কবিতা গুচ্ছ ঃ

"পৃথিবীতে যা কিছু সুন্দর যা কিছু মহৎ
কবিতা তাকে চিরঞ্জীব করে রাখে।" —শেলী

মুসলিম (গভঃ) উচ্চ বিদ্যালয়

(মোঃ কাজি মোস্তাফিজুর রহমান (রিমু)
৭ম শ্রেণী শাখা 'ক'

মুসলিম স্কুল মোদের
এই খানেতে পড়ি,
ভবিষ্যতের জীবনটাকে
এই খানেতে গড়ি।
বাবার মতো স্যারেরা সব
পিতৃতুল্য স্বভাব,
প্রাণে দরদ মুখে শাসন
পড়ান চমৎকার।
নয়তো কেবল পড়ার কথা
আরো জানার আছে,
খেলা-ধুলা লেখা-পড়া
শিখি তাদের কাছে।
তাই ভর্তি হতে হাজার ছেলে
হেতায় দেয় হানা,
মুসলিম (গভঃ) স্কুলের সুনাম
কার না আছে জানা।
প্রসংশার এই কথাগুলি
সংবাদ পত্রে বলে,
গর্ব মোদের গর্ব মোদের
জয় জয় জয়
ঢাকা (গভঃ) মুসলিম উচ্চ বিদ্যালয়।

* * * * *

★ অন্যের পাপ গুনিবার আগে, তোমার নিজের পাপ গুনো।

১৯৮৮ সনের বন্যা

মোঃ নুরুজ্জামান
দশম শ্রেণী' ক শাখা

৮৮ সনে হয়েছে এক ভয়াবহ বন্যা,
তা দেখে সকলের চোখে এসেছে কান্না।
ছিল আল্লাহর রহমত আর উপযুক্ত সরকার,
নতুবা ছিল না রক্ষা আর,
কারো ডুবেছে ঘরবাড়ী, কারো ডুবেছে ছাদ,
৮৮ সনের বন্যার আক্রমন থেকে কেউ পরেনি বাদ।
১৯৫৪, ৫৫ আর ৮৭ থেকে ইহা ছিল ভয়ঙ্কর,
কত যে মরেছে গবাদী পশু, আর মানুষ কে রেখেছে হিসাব তার॥
কত কোটি টাকার রাস্তাঘাট আর কত কোটি টাকার ফসল হানি,
কে দেবে হিসাব করেছে যা ৮৮ সনের বন্যার পানি।
কেউ রয়েছে ভেলার উপর কেউ বা রয়েছে ছাদে,
৮৮ সনের রাক্ষুসে বন্যা ফেলেছে সবাইকে ফাঁদে।
শেষ পর্যন্ত আল্লাহ্ দয়া আর সরকারের প্রচেষ্টায়,
ভেসে যাওয়া মানুষ পৌঁছে গেল ভাঙ্গার কিনারায়।
এখন হতে তাই, চল নামি ভাই পূর্ন বাসনের কাজে,
মুগ্ধ হবে আর আনন্দ পাবে স্বদেশ গড়া এই কাজেরই মাঝে।
এসো ভাই দু'হাত তুলে করি মোনাজাত,
এবারের বন্যা থেকে পাই যেন নাজাত।"

★ খিয়ানত দারিদ্রতা ডেকে আনে। (আল হাদিস)

★ নিশ্চয় বিশ্বাসীগণ একে অপরের ভাই। অতএব তোমরা তোমাদের ভাইদের মিত্রতা স্থাপন কর।
(আল কুরআন)

খোঁজে

মোঃ মাসুদু জামান খাঁন
পঞ্চম শ্রেণী শাখা—ক

কোনসে খোঁজে যাব আমরা,
আমরা সকলে।
মোদের খোঁজে একটা তরে,
আল্লাহ্ ছাড়া কে।
যিনি মোদের সৃষ্টি করে,
দিয়েছেন মোদের প্রাণ।
তাকে ছাড়া আমরা কাকে,
ভয় করব রে।
তার খোঁজে যাব আমরা,
আমরা সকলে।
যিনি নূরের আলো নিয়ে রাতে,
এসেছিলেন জগৎ বিশ্বে।
আল্লাহ্ তার উপর নাযিল করলেন
কুরআন শরীফ রে।

—❀—

আমাদের দেশ

কাজী মফিজুল ইসলাম
৬ষ্ঠ—শ্রেণী শাখা—খ

ফুল, ফল আর পাখির দেশ
আমাদের এই বাংলাদেশ।

এই দেশেরই মাটিতে
সোনার ফসল ফলে,
সবুজ সোনার ফসল
দেখতে ভাল লাগে।

পদ্মা, মেঘনা, যমুনা
বড় বড় নদী,
এই গুলো আমাদের
বাংলাদেশেরই নদী।

—❀—

গোলমাল

মোঃ রফিকুল ইসলাম
৮ম—শ্রেণী শাখা—খ

গোলমাল, গোলমাল
চারদিকে গোলমাল।
পথে-ঘাটে গোলমাল,
বিদ্যালয়ে গোলমাল।
ফুটপাতের খাবার খেয়ে
পেট করে গোলমাল।
যে দিকে তাকাই আমি
দেখি শুধু গোলমাল।

* ❀ *

★ সত্য মানুষকে মুক্তি দেয়—আর মিথ্যা মানুষকে ধ্বংস করে। (আল হাদিস)

"ফুটবল"

মোঃ তৌফিকুল ইসলাম
৯ম (খ) ক্রমিক নং—১০

শুরু হয়ে গ্যাছে ফের
দুরন্ত ফুটবল
লাঠিসোটা জমা হয়
জমা হয় দলবল

কোত্থেকে ছুটে এসে
ময়দানী মস্তান
খুন ক'রে খুন হ'য়ে
অবশেষে পস্তান

ল্যাং-গুতা ছোলানিতে
অন্যেরা কম যান
জনবল নেই তাই
মিঠে বুলি কপচান,

রেফারীর বুক খানা
প্রতিদিন ধুক্‌পুক্‌
হাত থেকে খসে যায়
বাঁশি আর নোট বুক

থেকে থেকে ঢোক গিলে
বেমালুম ঘাবড়ান
এই বুঝি দর্শকও
লাল ঘোড়া দাবড়ান!

ফুটবল উবে গ্যাছে
লাখ—টাকা মন্ত্রে
দুর্নীতি দাগাবাজি
আর ষড়যন্ত্রে।

O O O

জাগরে মুসলমান

তারিয়াম জমসীদ
দশম শ্রেণী, শাখা খ

কুরআন পড়ে কাঁদতে কাঁদতে
অন্ধ হলি মুসলমান,
ভালো চোখের হারিয়ে আলো,
ভুলে গেলি জীবন বিধান।

হায়রে বোকা মুসলমান
দুর্বল কেন করলি ঈমান?
মুসলমানের ঈমান হবে
পাহাড়সম শক্ত বিশাল।

হারিয়ে ফেলো না মনোবল,
জাগ্‌রে জাগো মুসলমান
জীর্ন ধরায় ছড়িয়ে দাও।
শ্রেষ্ঠ নবীর আহবান।

—O—

★ মুসলমানকে গালি দেওয়া ফিসক এবং তাদেরকে হত্যা করা কুফরী (আল হাদিস)

★ জ্ঞান পরিচ্ছদ আর ধর্ম অলঙ্কার, করে মাত্র মানুষের মহত্ব বিস্তার।

কৃষকের ভাগ্য

শেখ মোঃ শাহিন
৮ম শ্রেণী, খ শাখা,

প্রভাত বেলায় উঠিল সূর্য
ডাকিয়া উঠিল পাখী,
জাগিয়া উঠিল কৃষক বধূ
মেলিল তাহার আঁখী।
স্বামীকে তাহার ডাকিয়া কহিল,
ওঠো, লাঙল ধর।
বাঙালীর মুখে অন্ন জোটাইতে
ক্ষেতে গিয়া চাষ কর।
উঠিল কৃষক, ধরিল লাঙল,
লইল বলদ জোড়া
একটা যে তাদের রুগ্ন পীড়িত
অপরটি যে খোঁড়া
লইল জোয়াল, তুলিয়া দিল
বলদ জোড়ার কাঁধে
ক্ষেতে গিয়া সেই রুগ্ন কৃষক
সমস্ত দিন খাটে
ফলিল ফসল পাকিল তাহা,
তবু দুর্ভাগ্য হায়
মহাজন আসিয়া দেনার টাকা
ফেরত লইতে চায়।
অবশেষে তাহার সোনার ফসল
উঠিলনা আর ঘরে,
বাংলার কৃষক এমনি করিয়া
ধুঁকিয়া ধুঁকিয়া মরে।

—০—

তিনটি ছড়া

মোঃ তুহিনুর হাসান
ষষ্ঠ—শ্রেণী

(১) মস্তো ছাতা

আমের পাতা জামের পাতা
দাদুর মাথায় মস্তো ছাতা।
দাদুর বন্ধু করম শেখ
খায় কেবল গরম কেক।

★

(২) হাতী

বলো দেখি স্বাতী
কোথায় থাকে হাতী?
হাতী থাকে বনে
খুবই নির্জনে।

★

(৩) কোলা ব্যাঙ

গলা ফোলা কোলা ব্যাঙ
ছোট বড় চারটি ঠ্যাং।
ঠ্যাং তুলে দেয় লাফ
খোকা বলে বাপরে বাপ।

—০—

০ আল্লাহ পাকের কাছে ঐ গৃহ সর্বাপেক্ষা প্রিয় যে গৃহে সম্মানিত ইয়াতীম রয়েছে। (আল-হাদীস)

কবি

মোঃ কাজী ওমর ফারুক
৬ষ্ঠ শ্রেণী, খ শাখা, রোল—৯

আমি হতে চাই না কবি
তবুও লিখতে হবে কবিতা,
এ কেমন যন্ত্রণা বল দেখি
ভাই সবেরা।
লিখতে বসে যাই—
হায়! কি লিখবো ভেবে না পাই
মনে তবু আশা
হঠাৎ যদি লিখতে পারি খাসা?
বিশ্বভুবন ঘুরে দেখি
কবিতা আছে নাকি
কবিতা লিখতে না পারলে তবে
হওয়া যায় না কবি॥

রহমত আলী

মোঃ ফারুক হোসেন
৭ম শ্রেণী, খ শাখা

রহমত আলী, রহমত আলী
ক্ষিদে পেলে সে দেয় গালি।
চলতে গিয়ে সে চলে যায়
কত অজানা অলি গলি।

খেলতে গিয়ে মাঠে সে
বসে থাকে চুপচাপ,
খেলার সময় সে
পড়ে যায় ধুপধাপ।

স্কুল থেকে সে
দেরি করে আসে,
অকারনে বসে বসে
হি হি করে হাসে।

রহমত আলী, পেট তাঁর খালি,
পেটে নাই কিছু তাঁর, দিল সে গালী।
রহমত আলী, রহমত আলী।

★ যারা বিপদে সম্পদ দান করে, ক্রোধ দমন করে। আর লোকজনকে ক্ষমা করে, আল্লাহ এমন হিতকারীদের ভাল বাসেন। (আল কুরআন)

বিড়াল ছানা

মোঃ জামাল
৬ষ্ঠ – শ্রেণী শাখা – খ

বিড়াল ছানা, বিড়াল ছানা
খেলতে তুমি চাও,
লাফা-লাফি মারা-মারি
যা করতে চাও।
কি খেতে পাও?
দুধ ভাত খাও।
দু চোখ মেলে তাকাও
কুকুরের ভয়ে পালাও।
কুকুর ছানা দেখতে পেলে
পড়বে তোমার উপর লাফিয়ে।

) o (

অন্ধের হাতে বাতি

আ, ন, ম, আবদুল মান্নান
শিক্ষক (বিষয় ভিত্তিক)

আঁধার রাতে অন্ধ চলে
হাতে নিয়ে বাতি
মাটির কলস কাঁধে তার
পাছে তার নাতি।
পথিক শুধায় ওরে অন্ধ
কি দরকার বাতির
সমান তোমার দিবানিশি
আলো প্রদীপ-বাতির?
অন্ধ হেসে বলে ওরে
বাতি তোমার তরে
কলস আমার অটুট রেখ
তাই তো বাতি করে।

] o [

ঢাকায় থাকি

এস, এম, আরীফ হোসেন
পঞ্চম – শ্রেণী শাখা – ক

ঢাকা শহর থাকি
সব কিছুতেই ফাঁকি
ঘরের ভেতর মশা
খায়না পড়তে বসা
মাস্তান মিয়ার গাড়ী
চলছে তাড়াতাড়ি
গাড়ীর নীচে লোক
করছে না কেউ শোক
কি প্রয়োজন খাল বিল
নৌকা চলে মতিঝিল।
চোর ডাকাতের অত্যাচার
চলছে ঢাকা চমৎকার
এই শহরে থাকি
জীবনটাই ফাঁকি।

— o —

★ কথা বলার আগে চিন্তা করে দেখ সেটা বলা ঠিক হবে কিনা। (রাস্কিন)

ঘুড়ি

শেখ মসিউল হক
অষ্টম শ্রেণী 'ক' শাখা

নীল আকাশে রঙের ছটা,
ঝরে পড়ে ফোঁটা ফোঁটা,
এলোমেলো উড়ছে ঘুড়ি,
দেখে সবাই দিচ্ছে তুড়ি।
জীবন বাঁধা সুতায় তার,
ছিড়লে পরে পার।
ডানে বায়ে সবখানে,
আকাশের ঠিক মধ্যখানে।
উড়ছে ঘুড়ি টাল মাটাল,
কে দিবে তা সামাল।

—০—

ভেজাল

এ. বি. এম. সিদ্দিকী
অষ্টম শ্রেণী শাখা 'ক'

ভেজালে ভেজালে ছেয়ে গেছে
উচ্ছন্নে যাচ্ছে দেশটা
আসল পাওয়া কষ্ট ভারী
হাজার করেও চেষ্টা।
ঘিয়ের মধ্যে তৈল মেশায়
দুধের মধ্যে পানি মেশায়
গরুর গোশতে মহিষ মেশায়
ঔষুধের মধ্যেও ভেজাল মেশায়।
ভেজালে ভেজালে ছেয়ে গেছে
গোল্লায় গেছে দেশটা।

—০—

'পথকলি'

ডি, এম, রাজিবুল আলম
৮ম 'ক'

দারিদ্রের যাতাকলে নিষ্পেষিত মন,
ওরা আমাদেরই জন আমাদেরই আপন।
ওদের চলার পথে, থাকে নাতো হাসি
ওদের মনে মনে বেড়ায় নাকো খুশি,
সুন্দর ভাবে হেসে খেলে বাঁচতে তারা চায়
দারিদ্রের কশাঘাতে সবকিছু থেকে বঞ্চিত হয়ে যায়।
'টোকাই' নামে আমরা সবাই ওদের বলি,
কিন্তু ওরা যে 'টোকাই' নয় আমাদেরই পথকলি।

—০—

★ জন্মিলে মরিতে হবে রাখিবে স্বরন, যাইবেনা সাথে কেহ আত্মীয় স্বজন।

একুশে স্মরণে

মোঃ সাহাদৎ হোসেন (শান্ত)

প্রতি বছর ঘুরে এবারও এলো
একুশে ফেব্রুয়ারী।
এস ভাই, এস বোন সকলে মিলে
এই দিনকে স্মরণ করি।
বাঙ্গালী জাতি মোরা রাখতে বাংলার মান
ছালাম, বরকত, রফিক
এরা দিল বুকের তাজা রক্ত দান
সেই রক্তের বদলোতে,
পেয়েছি বাংলা ভাষা, এই নিয়ে আমরা গর্বিত
এই মোদের আশা ॥

—০—

দেশ প্রেম

মোঃ নাজমুল ইসলাম খান
দশম শ্রেণী, খ—শাখা

এই দেশেতে জন্ম আমার।
এই দেশেতে মৃত্যু আমার।
এই দেশেরই আলো হাওয়ায়
সকল আশার জন্ম আমার।
দেশকে আমি বাসব ভাল
আপন প্রাণ দিয়ে,
বিপদ যত আসবে ঘাড়ে,
মাথা পেতে নেব তারে,
ভয় পাব না বিপদ দেখে
এগিয়ে যাব সাহস নিয়ে।
দেশকে আমি গড়ব এবার
ভালবাসা দিয়ে।

—০—

স্বাধীনতা তুমি

মোঃ শামীম আলম
অষ্টম শ্রেণী, খ শাখা

স্বাধীনতা তুমি বাঙ্গালীদের বিজয়ের এক গান
স্বাধীনতা তুমি অত্যাচারীর মিথ্যার অবসান।
স্বাধীনতা তুমি বাংলাদেশের রক্তিম নিশান
স্বাধীনতা তুমি বাংলাদেশের তরতাজা এক প্রাণ
স্বাধীনতা তুমি দূর আকাশের উদিত শুক তারা
স্বাধীনতা তুমি সত্য-ভাল সব মিলিয়ে গড়া।

—×—

* "পরের দোষ তব কাছে যে জন কয়, জানিবে সে তোমার দোষ বলিবে নিশ্চয়।"

"বন্যা"

মোঃ জাকির হোসেন (তারিক)
৮ম শ্রেণী শাখা ক

চারদিকে দেখি শুধু পানি আর পানি,
লোকজন খাবার নিয়ে করছে টানা-টানি।
কোন দিকে জায়গা নেই পা রাখবার,
অসহায় দুর্গতরা করছে হাহাকার।
রাষ্ট্রপতি স্বয়ং বসে নেই আজ,
তার হাতে আছে এখন অনেক কাজ।
"৮৮" সনের বন্যা এত ভয়ানক,
দেশ আজ হয়ে গেছে সমুদ্রের মত বিপদজনক।

আমি এক শিশু

মোঃ মিরাজ উদ্দিন
নবম শ্রেণী শাখা -- 'ক'

আমি এক শিশু
চোখে আসে শুধু অশ্রু
৩/৪ বছর বয়সে পড়ার চাপ।
মাথায় ঢুকে না কিছু,
মার দেয় সবাই শুধু-শুধু।
আমি এক শিশু
কাউকে ক্ষতি করি না কিছু
মার খাই শুধু-শুধু।

বল আমার বল

মোঃ সাঈদ সালাহ উদ্দিন
পঞ্চম শ্রেণী, শাখা 'ক'

আমার কাছে আছে একটি ফুটবল
সেইটি আমার খেলার সম্বল।
বল খেলতে বড় ভাল লাগে
অন্য কাজে মন না আমার লাগে।
বল খেলতে ভেঙ্গে পা ব্যাথা পেয়েছি হাতে
বুকুনি ও খেয়েছি মায়ের তারি সাথে সাথে।
তবু বলি বল যে আমার প্রাণের চেয়ে প্রিয়
মাগো আমার জন্ম দিনে আরেকটি বল দিও।

000

000

000

স্মরণীয় ২১শে ফেব্রুয়ারী

মোঃ সালাহ্ উদ্দিন
দশম শ্রেনী (মানবিক বিভাগ) 'ক'

স্মরণীয় ২১শে ফেব্রুয়ারী,
দিনটি মোদের দুঃখ বহনকারী।
বাংলায় ছিল ৮ই ফাল্গুন,
দামাল-তরুনদের মনে ধরিয়েছিল আগুন।
মাতৃভাষায় বলবো কথা
এই তো মোদের সকলের আশা।
হতে দেবে না তা, হানাদার-পাক,
তাই তো এল আন্দোলনের ডাক।
পথের উপর থুব্‌ড়ে পড়ে
সালাম, বরকত, আরও অনেকে
প্রান দিল চিরতরে,
আহা! এই বাংলাভাষার তরে।
মাতৃভাষার জন্য লড়াই করল যারা
শহীদ হল অনেকেই তারা,
বিদায় নিলো তারা অনেকে
হতে পৃথিবীর বুক,
সঙ্গে নিলো আরও বিদায়
এই বাংলার মায়েদের সুখ।

—0—

দাদুর গল্প

মুহাম্মদ মাসউদ নোমানী
৯ম – শ্রেণী শাখা খ

বুড়ো দাদু
গল্প বলে
অবাক লাগে ভাই।
সত্যি বলি
গল্প বলার
জুড়ি তার নাই।
দেশের কথা
বলতে গিয়ে
গর্ব করে বলে।
গোলা ভরা
ছিল ধান
বিলীন হল কালে।
গোয়াল ভরা
গরু ছিল
এখন তাহা ফাঁকা।
মাছে ভরা
পুকুর নালা
সবই এখন ফাঁকা।

—0—

এলো-মেলো ছড়া

চৌধুরী নাফিজ সরাফাত
৬ষ্ঠ—শ্রেণী শাখা—খ

খবর

রটল খবর জবর রকম
যেইনা বিবিসিতে
খবর শুনে ঘামলো সবাই
বরফ জমা শীতে।

সেই খবরই এমনভাবে
করলো প্রচার ভোয়া,
ভুয়া কিনা ? দ্বিধায় সবার
বন্ধ খাওয়া শোয়া

খবর ছড়ায় তড়িৎ বেগে
এ, এফ, পি আর এ, পি,
আড্ডাতে কেউ টেবিল ভেঙ্গে
করছে ক্ষ্যাপা-ক্ষেপি।

প্রচার যখন করলো সেটা
'বাসস' ও 'এনা'
বদলে গেলো চেহারা তার
যায়না তারে চেনা।

—০—

বনের পাখী

সৈয়দ মাহবুব উর রহমান
৬ষ্ঠ—শ্রেণী শাখা—খ

ছোট্ট একটি পাখি
তাকে কেমনে ধরে রাখি ?

সে যে ছিল বনের পাখি,
বনেই থাকতে চায়,

যতই তাকে যতন করি,
কিছুতেই পোষ মানতে নাহি চায়।

হৃদয় যে তার দুঃখে ভরা,
দেখতে কেমন যে মন হারা।

পাখির এই করুণ হৃদয় দেখে,
মনটা আমার স্নেহের ছোঁয়ায় গেল মেখে।

তাইতো আমি ছেড়ে দিলাম তারে,
মুক্তভাবে উড়ে গেল সে অক্ষরে।

—০—

★ ঘুষদাতা এবং ঘুষ গ্রহীতা উভয়ই জাহান্নামের আগুনে জ্বলবে। (আল-হাদীস)

শহর

মোঃ ইউসুফ ইবনে ইসলাম
৭ম—শ্রেণী শাখা—খ রোল নং ৬৭

আহা দেখবো শহর
চড়বো গাড়ি যাবো বাড়ি।
গাঁয়ে আছে মামার বাড়ি
সেই খানেতেই হাতে খড়ি।
মামার কাছে বায়না ধরি
ঢাকা যাবো ঘোড়ায় চড়ি।
ঘোড়ায় চড়ে ঢাকা এলাম
কত গাড়ি দেখতে পেলাম।
কিন্তু আহা শহর কোথায়
মনে হয় ঐ হেথায়।
কোথাও কোন নেইকো শহর
শুধু আছে গাড়ির বহর।

) × (

বসন্ত

মাহগুকুর রহমান চিশতী
পঞ্চম—শ্রেণী শাখা—ক

বসন্ত এল তাই গাছে গাছে পাখি
বসন্ত এল তাই সবুজের ঢেউ আঁকি
বসন্ত এল তাই গাছের কঁচি পাতা দেখি
বসন্ত এল গাছের শাখায়
বসন্ত এল গাছের বোটায়
বসন্ত এল সবার মুখে হাঁসি
বসন্ত আনল সবার খুশী।
আনল গাছের পাতায়
মিষ্টি পাখির গান।
তাই শুনে আমার মনে
উঠল খুশীর বান।

—0—

দেশ প্রেম

মোঃ নাজমুল ইসলাম খান
(সংগ্রাম)
৮ম—শ্রেণী শাখা - ক

এই দেশেতে জন্ম আমার
এই দেশেতে মৃত্যু আমার.
স্নেহে আমি বড় হয়েছি,
এই দেশেরই কোলে।
দেশকে আমি বাসব ভালো
আপন প্রান দিয়ে।
বিপদ যত আসবে ধারে
মাথা পেতে নেব তারে।
ভয় পাবনা বিপদ দেখে
এগিয়ে যাব সাহস নিয়ে।
দেশকে আমি গড়ব এবার
ভালোবাসা দিয়ে।

—০—

'ধাঁ ধাঁ'

শেখ ইমতিয়াজ নুর
৬ষ্ঠ শ্রেণী, খ শাখা

১। মাথা নেই মুখ আছে, পা নেই পেট আছে।
উঃ বোতল

২। জলে চলে কিন্তু গায়ে পানি লাগে না।
উঃ জোনাকী পোকা।

৩। কোন জিনিস কাটলে সাথে সাথে বড় হয়।
উঃ মাটির গর্ত।

৪। কোন জিনিস টানলে ছোট হয়।
উঃ সিগারেট।

৫। কোন দেশে মাটি নেই।
উঃ সন্দেশ।

৬। বাগান থেকে বের হলো এক হুমো, তার গাঁ ডুমো ডুমো।
উঃ কাঠাঁল ও লিচু।

৭। কোন শহর খুলে না।
উঃ খুলনা।

৮। টাকা আছে খুলোনা, খুল্লে পরে পাবে না।
উঃ টাকা, খুলনা, পাবনা।

৯। আম নই জাম নই গাছে নাহি ধরে, তবু সকল লোকে তারে ফল বলে জানে।
উঃ পরীক্ষার ফল।

১০। চিলি চিলি পাতা মোটা ডাল ফলটি পাকা বিচিটি লাল।
উঃ তেতুঁল।

১১। তুমি আমি একজন দেখিতে একরূপ, আমি কত কথা কই তুমি কেন থাক চুপ।
উঃ নিজের ছবি

১২। নাই মুখ নাই মাথা টিবি দিলে বলে কথা।
উঃ রেডিও।

১৩। হায় তরমুজ কি করি, বোটা নাই কি ধরি।
উঃ ডিম।

১৪। কোন পাখির ডিম নেই।
উঃ বাঁদুর।

১৫। এক হাত গাছটা ফল ধরে পাঁচটা।
উঃ হাতের পাঁচ আঙ্গুল।

১৬। আছার দিলে ভাঙ্গে না টিপ দিলে সয় না।
উঃ ভাত।

'ধাঁ ধাঁ'

চৌধুরী নাফিজ সরাফাত
৬ষ্ঠ শ্রেণী, খ শাখা, রোল—১

১। সাগরে জনম নগরে বাস,
মায়ের ছোঁয়া পেলে হয় সর্বনাশ।

২। পাঁচ ভাই তুলে দিল বত্রিশ ভাইয়ের ঘাড়ে
দ্বারে ছিল বুড়ো বেটা টেনে নিল ঘরে।

৩। একটুখানি পুকুরটা জল টলমল করে
ছোট্ট একটু কনা পড়লে সর্বনাশ করে।

৪। আগে আগে যায়
পিছু পিছু চায়
পিছের জন চায় কি?
ওর বাবা বিয়ে করেছে
আমার বাবার ঝি।

৫। গাছ নাই, তার শুধু পাতা
মুখ নাই, সে বলে কথা
বুদ্ধি নাই আপন ঘরে
বুদ্ধি বিলায় যারে তারে।

৬। লতা নয় পাতা নয়
লতিয়ে লতিয়ে যায়,
সর্বাঙ্গ থাকতেও
লোকের চক্ষু দুটি খায়।

উত্তর ঃ—

১। লবণ ৩। চোখ ৫। বই
২। আঙ্গুল, দাঁত, জিহবা ৪। মামা ও ভাগ্নে ৬। ধুঁয়া

ইংরেজী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা :

সিরাজ উদ্দীন আহমদ
এম, এ, বি; এড (সহঃ শিক্ষক)

ভাষা শিক্ষার উদ্দেশ্য হচ্ছে বলতে পারা, লিখতে পারা ও নিজের মনের ভাব সুন্দর ভাবে ব্যক্ত করার ক্ষমতা অর্জন করা। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, আমাদের দেশের ছেলেরা না জানে লিখতে না জানে পড়তে ও মনের ভাব ব্যক্ত করতে। একজন ছেলে নকল করে বি, এ, এম, এ, পাস করে ডিগ্রী নিতে পারে। কিন্তু বাস্তব জীবনে তাকে ব্যর্থ হতে হয়। কারণ সরকারী চাকরী পেতে হলে তাকে প্রতিযোগিতা মূলক পরীক্ষায় পাশ করতে হয়। উহাতে আর নকল করা চলে না। আমাদের দেশ উন্নয়নশীল দেশ। উহাতে আছে নানাবিধ সমস্যা। বহির্বিশ্বের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ রাখতে হচ্ছে। আমাদের ছেলেদিগকে যেমনি ভাবে মাতৃভাষা ভাল করে শিখতে হবে। তেমনি ভাবে আন্তর্জাতিক ভাষা ইংরেজীকেও শিখতে হবে। কারণ দেখা যাচ্ছে, ডাক্তারী, ইঞ্জিনিয়ারিং, কৃষি ও আইনের পুস্তক সবই ইংরেজী ভাষায় লিখিত। বিশ্বের অধিকাংশ জ্ঞান বিজ্ঞানের ভান্ডার ইংরেজীতে লিপিবদ্ধ। কাজেই ইংরেজীকে যখন কোন মতেই এড়াতে পারা যায় না। তখন ইংরেজী মনোযোগের সহিত পড়তে হবে ও সাধনা করতে হবে। ইংরেজী এমন একটি ভাষা যা বিশ্বে দোভাষীর কাজ করে। বিদেশে উচ্চ শিক্ষা লাভ করতে হলে ইংরেজী ভাষা অবশ্যই শিখতে হবে। সত্যি কথা বলতে কি বাংলা ও ইংরেজী ভাষা মাধ্যমিক স্তরে যা আয়ত্ব হয়ে থাকে। ইহার পর তেমন আর হয় না। পরে ছাত্রদেরকে জীবিকার্জন মূলক বিভিন্ন গ্রুপের উপর জোর দিতে হয়।

ইংরেজী বিদেশী ভাষা। ইহা আয়ত্ব করা তেমন সহজ সাধ্য নয়। ছাত্রদেরকে দৈনন্দিন প্রচেষ্টা করে অনুশীলনের মাধ্যমে ইংরেজী ভাষাকে আয়ত্ব করতে হয়। না বুঝে একটা শব্দ ও পড়া উচিত নয়। ছাত্রদেরকে Spoken English এবং Written English এর উপর বিশেষ করে জোর দিতে হবে। ইংরেজী শিখতে হলে ছাত্রদেরকে ইংরেজীতে কথা বলা অভ্যাস করতে হবে। গল্পের মাধ্যমে ইংরেজী শিক্ষা করা সহজ। ছাত্রদেরকে ইংরেজী Story Book বেশী বেশী পড়তে হবে। বিভিন্ন Functionl English হইতে Worked out translation voraciously পড়তে হবে। একে অন্যের সাথে ইংরেজীতে সদা সর্বদা সখ করে কথা বলার প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। আধুনিক ইংরেজী লেখকদের লেখার সঙ্গেও পরিচিতি লাভ করতে হবে। এতে দেখা যাবে অল্প-দিনের মধ্যেই ইংরেজী ভাষার উপর একটি ছাত্রের দখল এসেছে। আমাদের দেশের মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় যত ছাত্র অকৃতকার্য হয় তার বেশীর ভাগই অকৃতকার্য হয় ইংরেজীতে। ইংরেজী ভাষা একবার আয়ত্ব করতে পারলে ছাত্রদের মাথার বোঝা বহুল পরিমানে কমে যাবে।

এটা নিশ্চিত বহির্বিশ্বের সঙ্গে যোগাযোগ ও যাতায়াতের পথ সুগম হয়ে যাবে। ইংরেজী শিক্ষার ব্যাপারে একজন ইংরেজ শিক্ষাবিদ বলেছেন, "A book may be others. But it muslifarious through plagiarism. A book should be read and re-read". কাজেই, একজন শিক্ষার্থীর ইংরেজী বই পড়ার মন মানসিকতা থাকতে হবে। এ নিয়মে সাধনা করলে শিক্ষার্থী অতি সহজেই ইংরেজী ভাষায় দখল আনতে সক্ষম হবে।

—*—

★ তিনটি বস্তু মানুষকে ধ্বংস-করে লোভ, হিংসা ও অহংকার। (ইমাম গাজ্জলী (রাঃ))

)ঃ(

★ সত্যকথা বলা, আমানত রক্ষা করা এবং ওয়াদা পালন করা ঃ এ তিনটি মোমেনের লক্ষণ।
(আল-হাদীস)

Some Useful Aphorisms

সৈয়দ হাসান আতিক
দশম—শ্রেণী শাখা—খ

1. "A religion that is small enough for our understanding would not be large enough for our needs." (Arthur Balfour)
2. "Strength of the mind comes from exercise, not from rest."—
(Alexander Pope)
3. "The will to live is animal, the will to let live is human, the will to help others live is divine." (Rabbi Abraham R Besdin)
4. "Good breeding consists of concealing how much we think of ourselves and how little we think of the other person."— (Mark Twain)
5. "That man is admired above all men, who is not influenced by money."
(Cicero)
6. "I never did one day's wark in my life—it was all fun."— (Thomas Edison)
7. "We may make a good beginning, with an eagar willing heart. But to know the joy of winning, we must finish what we start.,' =
(Mary Hamlett Goodman)
8. "Hope is generally a faulty guide, though it is very good company along the way." – (Lord Halifax)
9. "If you want to be successful, it is just this simple, know what you are doing. Love what you are doing And believe in what you are doing." –
(Will Rogers)
10. "Truth is the jewerlery of lenguage."— (Hazrat Ali)

— 0 —

* "A bad workman quarrels with his tools."
* "নাচতে না জানলে উঠান বাঁকা"
* সুজনে সুযশ গায়, কুযশ ঢাকিয়া
কুজনে কুরব করে সুরব নাশিয়া।
* দুর্জন বিদ্যান হলেও পরিত্যাজ্য।

Some Quotations

Md. Salauddin
Class –X Sec.—A

1. What's in a name? That which we call a rose, by any other name would smell as sweet. (Shakespeare)
2. The best of all medicines are rest and fasting. (Franklin)
3. None but a fool is always right. (Hare)
4. Without constancy there is neither love, friendship, nor virtue in the w rld. (Addison)
5. Ability is a poor man's wealth. (M. Wren)
6. A thing of beauty is a joy for ever. (Keats)
7. It is not death, it is dying that alarms us. (Montaigne)
8. All's well that ends well, still the finis is the crown. (Shakespeare)
9. We cannot do evil to others, without doing it to ourselves. (Desmahis)
10. A good face is the best letter of recommendation. (Queen Elizabeth)
11. No man is free who is not master of himself. (Epictetus)
12. Life has no blessing like a prudent friend. (Euripides)
13. An honest man is the noblest work of God. (Pope)
14. The end must justify the means. (Prior)
15. Necessity is the mother of invention. (Farquhar)
16. The greatest pleasure of life is love. (Sir W. Temple)
17. Speech is great, but silence is greater. (Carlyle)
18. Revolutions are not made, they come. (Wendell Phillips)
19. Riches are not an end of life, but an instrument of life (H. W. Beecher)
20. Right is might, and ever was, and ever shall be so. (Hare)

— 0 —

★ চরিত্র জীবনের অমূল্য সম্পদ ।

★ জন্ম হউক যথা তথা কর্ম হউক ভালো ।

Classification of Parts of Speech

NOUN কে ৫ ভাগে হয়েছে ভাগ করা

PRONOUN কে ৮ ভাগে হয় আমাদের ধরা

ADJECTIVE কে ৪ ভাগে বিভক্ত করা হয়

২টি অংশ VERB এর মূলে দেখি সদাশয়

ADVERB এর ৩টি ভাগ GRAMMAR এ দেখি

PREPOSITION ৭টি ভাগে সর্বদাই লেখি

INTERJECTION এর ভাগ নেই জেনে রাখুন সবে

CONJUNCTION এর ২টি ভাগ আছে কিন্তু তবে

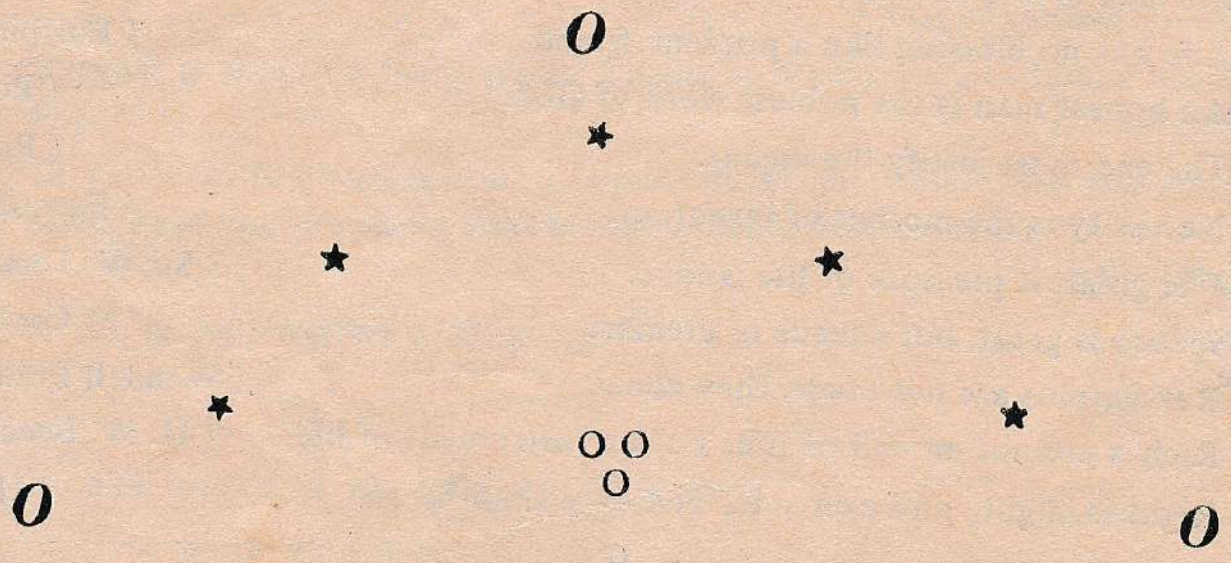

★ শৈশবে ভব্রত না শিখলে পরিনত বয়সে মহত্ব ভাল হয় না। (সাদী)

'৮৯' সনে স্কাউটদের কর্মতৎপরতা

মোঃ আরিফ
শ্রেণী ৮ম, 'ক' রোল নং ৭

'৮৯ সনের ২৭ শে জানুয়ারী আমরা আমাদের স্কাউট শিক্ষক সহ ১৭ জনের একটি স্কাউট দল গভর্নমেন্ট মুসলিম হাই স্কুল থেকে গাজীপুর মৌচাকে ১টা ৩০ মিনিটে রওয়ানা করলাম বার্ষিক তাবু যাপন প্রশিক্ষণের উদ্দ্যেশে। বিকেল ৪টায় দিকে আমরা সেখানে উপস্থিত হলাম, সেখানে ১২০টা স্কুল অংশ গ্রহণ করেছিল। বিকেল ৫টায় ক্যাম্প উদ্বোধন করা হয়েছিল। ক্যাম্প উদ্বোধন করেন ক্যাম্প-চীফ জনাব কফিল উদ্দিন। সেখানে চারদিন আমাদের প্রশিক্ষণ দেয়া হল এবং শেষদিন পরীক্ষা নেয়া হয়। সেই পরীক্ষায় আমাদের স্কুল ১২০টি স্কুলের মধ্যে কৃতিত্বের সাথে ষষ্ঠ স্থান অধিকার করে একটি সীল লাভের গৌরব অর্জন করি।

আমাদের দ্বিতীয় সফলতা হলঃ

★ ঢাকা রেসিডেন্সিয়াল মডেল হাই স্কুলে ২১ দিন ধরে প্রশিক্ষণ ও বিভিন্ন পরীক্ষার পর আমাদের স্কুলের ৭ জন স্কাউটই ২৬ শে মার্চের মার্চ পাষ্টে অংশ গ্রহণ করে। সেখানে নিয়ম ছিল ২১ দিন প্রশিক্ষণের পর পরীক্ষায় যারা অকৃতকার্য হবে তারা ষ্টেডিয়ামে যেতে পারবে না। কিন্তু আমাদের স্কুলের ৭জনই স্টেডিয়ামে গিয়েছিল।

★ ১৭ ই আগষ্ট আর্মানিটোলা হাই স্কুলে আমাদের স্কুল পরীক্ষা দিয়ে নবম হয়ে জাম্বুরীতে যাওয়ার সুযোগ পায়। জাম্বুরীতে মোট ৪৫ টি স্কুল অংশ গ্রহণ করার সুযোগ পায়।

★ ২৫ শে সেপ্টেম্বর আমাদের স্কুলের ৮ জন স্কাউট মতিঝিল স্কুলে প্রি-ক্যাম্প করে। সেখানে ২৮ শে সেপ্টম্বর পর্যন্ত জাম্বুরীর বিভিন্ন বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

জাম্বুরীতে যাওয়ার জন্য আমাদের স্কুলের ৮ জন স্কাউট অন্যান্য স্কাউটদের সঙ্গে সরকারী বিজ্ঞান কলেজে ১৮ দিন ধরে পিটি, খেলাধূলা ও বিভিন্ন রকম কৃষ্টি ও সাংস্কৃতি শিখে।

★ অবশেষে আমরা ২৫ শে ডিসেম্বর জনাব ইদ্রিস সাহেব সহ ৯ জন স্কাউট মৌচাকে যাই। ২৫ শে ডিসেম্বর রাষ্ট্রপতি এরশাদ জাম্বুরী উদ্বোধন করেন। জাম্বুরীতে আরো ৪টি দেশ অংশ গ্রহণ করে। দেশ গুলো হলো দঃ কোরিয়া, অষ্ট্রেলিয়া, শ্রীলঙ্কা, নেপাল ও বিশ্ব স্কাউট সংস্থার একজন। জাম্বুরীতে আমাদের ৮ জন স্কাউটই বিভিন্ন উত্তরণে যোগদান করে ২৮ টি করে স্টিকার পেয়েছিল। সেখানে নিয়ম ছিল যারা ২৪টির উপরে স্টিকার পাবে তাদের জাম্বুরীর সর্বোচ্চ পদক জাম্বুরী মেডেল দেয়া হবে, ২৮টি করে স্টিকার পেয়ে আমাদের ৮ জন স্কাউটই সেই দুর্লভ মেডেল ছিনিয়ে নেয়।

হাতের লেখার গুরুত্ব

—ওবায়দুল হক মিয়া
সহকারী শিক্ষক

সর্বযুগের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ আল কোরআনুল করিমে মহান আল্লাহ কলম শব্দটি একাধিকবার উল্লেখ করেছেন। যেমন কোথাও তিনি ঘোষণা করেছেন —যে মানব জাতিকে কলমের মাধ্যমে শিক্ষাদান করেছেন এবং কোথাও ভাষা লিপিবদ্ধ করার জন্য ব্যবহৃত কলমের শপথের কথা উল্লেখ করেছেন। কলম শব্দটি মূলতঃ আরবী হলেও বাংলা ভাষার অস্থি-মজ্জার সাথে মিশে গেছে। ফলে বাংলা পরিভাষায় ব্যবহৃত লেখনী বা মসির চেয়ে কলম শব্দের রূপ-রস-গন্ধ-স্বাদ আমাদের কাছে বেশী আকর্ষনীয় বলে মনে হয়। মানুষের ভুলের প্রবনতা রোধ করা এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াবলী যুগ যুগ ধরে স্থায়ীভাবে সংরক্ষণ করার সার্থক প্রয়াসের জন্য পবিত্র কালামে কলমের ব্যবহার সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ইঙ্গিত প্রদান করা হয়েছে। সেই জন্যই লেখনীর ব্যবহার শুরু হয়েছে স্মরনাতীত কাল থেকে আর হাতের লেখার কলা-কৌশল আয়ত্ব করা মানুষের জন্মগত গুণ। সর্বযুগের এবং দেশের সকল শ্রেণীর কবি সাহিত্যিক লেখক চিন্তাবিদ ও বৈজ্ঞানিকের অমূল্য জ্ঞানভাণ্ডার-দেশের জন্য স্থায়ী সম্পদ হিসেবে লেখার মাধ্যমে সংরক্ষণ করা সম্ভব ও সহজ হয়েছে। বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ মানব হযরত মোহাম্মদ (দঃ) এর কাছে যে অহি বা প্রত্যাদেশ অবতীর্ন হ'ত তা তিনি সংরক্ষণের জন্য এতটুকু সতর্কতা অবলম্বন করতেন যে তিনি উক্ত প্রত্যাদেশের অংশ বিশেষ সাথে সাথে কণ্ঠস্থ করে ফেলতেন এবং ভুল-ভ্রান্তির হাত থেকে অক্ষত রাখার জন্য নির্ধারিত লেখক গোষ্টির দ্বারা লেখায়ে রাখতেন, অথচ তিনি নিরক্ষর ছিলেন, কাগজ না থাকার দরুন পশুর চামড়া, গাছের বাকল, কাঠের পাতলা তক্তার মধ্যে তা লেখা হ'ত।

আধুনিক যুগ জ্ঞান বিজ্ঞানের উন্নতি উচ্চ শিখরে আরোহণ করেছে বলে আমাদের ধ্যান-ধারণা। যে দেশের শতকরা নিরানব্বই জন শিক্ষিত, সে দেশে সবাই হাতের লেখার ব্যবহার করে থাকে। এমন কি আমাদের মত উন্নয়নমুখী দেশের অধিকাংশ নিরক্ষর ব্যক্তিবর্গ ও মুষ্টিমেয় শিক্ষিত ব্যক্তির মাধ্যমে তাদের হাতের লেখার প্রয়োজনীয়তা মিটায়ে থাকেন। মোদ্দা কথা, হাতের লেখা ব্যতীত অফিস-আদালত, কলকারখানা, স্কুল-কলেজ, ইত্যাদি কল্পনা করা অসম্ভব। এমন কি ব্যক্তিগত জীবন পারিবারিক জীবন, সামাজিক জীবন, রাষ্ট্রীয় জীবন অচল হতে বাধ্য। জ্ঞানাহরনের অপরিহার্য অঙ্গ হস্তলিপি, মৌখিক ভাষার সাহায্যে জ্ঞানলাভ যথাযথ ভাবে এবং পূর্ণভাবে সম্ভব নয় বলেই লেখ্য ভাষা ব্যবহার ওতপ্রোত ভাবে জড়িত।

ঢাকা গভর্নমেন্ট মুসলিম হাই স্কুল/বার্ষিকী

মানব সভ্যতার চাবিকাঠি এবং উন্নতির প্রকৃষ্ট সোপান হস্তাক্ষর—এ কথা সতসিদ্ধ হিসাবে মেনে নিলে আমাদের কি লাভ? আমাদের দেশের শিক্ষাঙ্গনে হাতের লেখাকে সুন্দর ও পরিছন্ন করার ব্যাপারে কি পরিমানে প্রচেষ্টা ও তৎপরতা চালান হচ্ছে তা চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখানের প্রয়োজন নেই বলে মনে করি। বিশেষ করে প্রাথমিক স্তরের বিদ্যায়তনের এ সম্বন্ধে সরকারী বেসরকারী বা ব্যক্তিগত উদ্যোগ নেই বললে অযুক্তি হবে না। এব্যস্ত ত্রস্ত যুগে কচি-কাঁচার হাত ধরে-কলম ঘুরায়ে ফিরায়ে হাতের লেখাকে সুন্দর করার মত ফুসরত আছে কার? এক কালের বহুল প্রচলিত সীতানাথ বসাকের আদর্শ লিপির অমূল্য বাণী হস্তাক্ষর সুন্দর হইলে পরীক্ষায় অধিক নম্বর পাওয়া যায়—এ উৎসাহ আজকালের পাঠ্য পুস্তকে তেমন চোখে পড়ে না। তেমনি ভাবে প্রশ্ন পত্রের গোড়ার দিকে সুন্দর হাতের লেখার জন্য কিছু নম্বর রিজার্ভ রাখার ব্যবস্থা আজকাল তেমন দেখা যাচ্ছে না। বৈজ্ঞানিক যুগের একটাকে বিশেষ উপহার সংক্ষিপ্ত করণ—সেইজন্য আজকাল আর এই সবের তেমন বালাই নেই। কোনমতে একটা কিছু লিখতে পারলেই তো হল। অতসব ঝামেলা পোহানে দরকার কি? সাধারণ ভাবে আমাদের বিদ্যানিকেতন সমূহে সুন্দর হাতের লেখা বিশিষ্ট শিক্ষার্থীর সংখ্যা শতকরা কত? খুব বেশী হলে ৪০% থেকে ৫০% জন হবে। বাকী ছাত্র-ছাত্রীদের হাতের লেখা পড়তে গেলে রীতিমত চোখে পানি আসে।

ভাবতে বড়ই ব্যথা লাগে উন্নতশীল দেশ সমূহে শতকরা একশত জন শিক্ষার্থীর হস্তলিপিই স্পষ্ট এবং সুন্দর। কি করে তা সম্ভব? এমন কি আমাদের দেশের শহর বন্দরে প্রতিষ্ঠিত মিশনারী স্কুল সমূহের ছাত্র-ছাত্রীদের হাতের লেখা পাইকারী হারে সুন্দর ও ঝকঝকে। মিশনারী স্কুলে ব্যয়কৃত টাকার ওজন বা মূল্য কি বেশী? যার ফলে এরূপ সম্ভব। হাতের লেখা সুন্দর করে তোলার ব্যাপারে প্রাথমিক পর্যায়ে শিক্ষক ও অভিভাবক শ্রেণী চেষ্টার ত্রুটি না করলেই সব কিছু ঠিক,ঠাক হয়ে যায়। যে দেশের অভিভাবক মন্ডলীর বেশীর ভাগ রুজি রোজগারে দিবারাত্রি এক-টানা খেটে মরছেন—তাদের পক্ষে তো প্রতি পাল্যের হাতের লেখা ঠিক করার প্রয়াস চালান সম্ভব নয়। শুধু তাই নয় তাদের লালিত পালিত সন্তান সন্ততি রীতিমত স্কুলে আসে কিনা বা পড়া শিখল কিনা এসব ব্যাপারে মাথা ঘামানোর প্রয়োজনীয়তা মনে করেনা। বা সময়ও দিতে পারে না। ওদিকে ছাত্রছাত্রী ভরপুর শ্রেণীকক্ষে একজন শিক্ষকের পক্ষে হাতের লেখা সুন্দর করার মত ফালতু কাজের সময় করা সমীচীন বা প্রয়োজন মনে করা হয় না। দেশের বিভিন্ন জাতীয় পর্যায়ে গৃহীত পরীক্ষা সমূহে অকৃতকার্যের সংখ্যা এতবেশী হবার পিছনে অস্পষ্ট হাতের লেখার কি কোন পরোক্ষ প্রভাব নেই? চাকুরী বাকরীর সন্ধানলাভ এবং পদোন্নতির বেলায় কি এর কোন মূল্য বা গুরুত্ব নেই? এর জবাব কে দেবে। কার ঠেকা পড়েছে? যা পারবে কোন মতে খাতায় লিখতে পারলেই তো হল—এসবই অনেকের মূল্যবান অভিমত।

হাতের লেখা সুন্দর করার উপায় মাত্র তিনটি—যথাঃ (১) প্রতিটি অক্ষর সমান আকারে হতে হবে। (২) প্রতিটি অক্ষর লম্বা হতে হবে এবং (৩) প্রতিটি বর্ণ ও শব্দ ও লাইনের মাঝে পরিমিত

ফাঁক রাখা একান্ত প্রয়োজন। একটি সামান্য সতর্কতা অবলম্বন করে এই তিনটি নিয়ম মেনে চললে লেখা সুন্দর হ'তে বাধ্য। দায়িত্ব পালন, আত্মবিশ্বাসী এবং কর্তব্যপরায়ন ব্যক্তিবর্গ মাত্রই সুন্দর হাতের লেখার অধিকারী। এটা অবশ্য রূপকথা নহে। উন্নত দেশ সমূহের বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান গুলোতে যথার্থ দক্ষ লোক নিয়োগর ব্যাপারে হাতের লেখা বিশারদকে মোটা মাইনে দিয়ে নিয়োজিত করা হয়। লোক নিয়োগের ক্ষেত্রে এসব বিশারদের রির্পোটই নির্ভরশীল। বাম হাতের ব্যাপার, মামা ভাগ্নের সম্পর্কের মত স্বজন প্রীতির অব্যর্থ হাতিয়ার গুলো সে সব দেশে তেমন কার্যকর নহে। যে শিক্ষার্থী তরুণ বয়স থেকে নিজের শ্রমলব্ধ বর্ণ সমূহকে সাজায়ে-গুছায়ে পরিমিত ফাঁক রেখে লম্বা লম্বা ভাবে গেঁথে সুন্দর ভাবে শব্দ মালা তৈরী করতে পারে না বা শিখে নেই—কর্ম জীবনে বিভিন্ন দায়িত্বপূর্ণ কাজ কিভাবে তার দ্বারা সম্ভব হবে? মোট কথা সুন্দর করে লেখতে গেলেই কিছুটা চিন্তা ভাবনা, মানসিক স্থিরতা ও কলাকৌশলের প্রয়োজন হয়। বলা বাহুল্য এসব গুনাবলীর অধিকারীরাই জীবন সংগ্রামে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে।

অপক্ষ পক্ষে পরনির্ভরশীলতা খামখেয়ালীপনা হৃদয়ের সংকীর্নতা, মমত্ববোধ হীনতা ও মানসিক চঞ্চলতা ইত্যাদির বহি প্রকাশ হ'ল হাতের লেখার অস্পষ্টতা। কেননা মনোবিজ্ঞানী গণ একথায় সর্ব সম্মত যে মানুষের মানসিক পরিস্থিতি, তার আশা-আকাঙ্খা তার হাতের লেখার মাধ্যমেই ফুটে ওঠে তার জীবনের গতিবিধি, ব্যক্তিত্ব, নানাবিধ মানসিক জটিলতা পর্যন্ত হাতের লেখার মধ্যে ধরা পড়ে। অধুনা জার্মানের বহু ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে হাতের লেখার চুলচেরা বিচার বিশ্লেষণ ও গবেষণা করেই চাকুরীতে লোক নিয়োগ করা হয়। হামবুর্গ ফ্রেরুর্গর মত বিশ্ববিদ্যালয়ে হাতের লেখার উপর পড়াশুনার জন্য বিভাগ খোলা হয়েছে। সুইজারল্যান্ড, বন, জুরিখ ও সুইডেন ইত্যাদি স্থানের কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় গুলোতেও হাতের লেখার মনস্তাত্তিক বিশ্লেষণের উপর পড়াশুনার ব্যবস্থা আছে।

সে যাইহোক হাতের লেখা বোধগম্য না হবার দরুণ কত কষ্ট-ঝামেলা ও গোলযোগে পড়তে হয় তার লেখাজুকা নেই। সে জন্য জাতীয় স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য করলে হস্তাক্ষর ভাল করার জন্য সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে উদ্যোগ গ্রহণ করা অপরিহার্য দায়িত্ব বলে মনে করি। এ ধরণের জাতীয় অভিশাপ থেকে যত আগে মুক্ত হওয়া যায় ততই ভাল। ভুল হাতের লেখার জন্য পরীক্ষায় তুলনা মূলক ভাবে একটু বেশী নম্বর প্রদানের ব্যবস্থা করা খারাপ হাতের লেখার জন্য কঠোরতা প্রদর্শন করা এবং সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের শিক্ষকমণ্ডলীর এই ব্যাপারে গাফলতি পাওয়া গেলে বিভাগীয় কতৃপক্ষের নিকট জবাবদিহীর ব্যবস্থা প্রবর্তন করা ইত্যাদির মাধ্যমে এই নাজুক পরিস্থিতর উন্নতি ঘটতে পারে।

—০—

ডারফিন মুসলিম হোষ্টেল

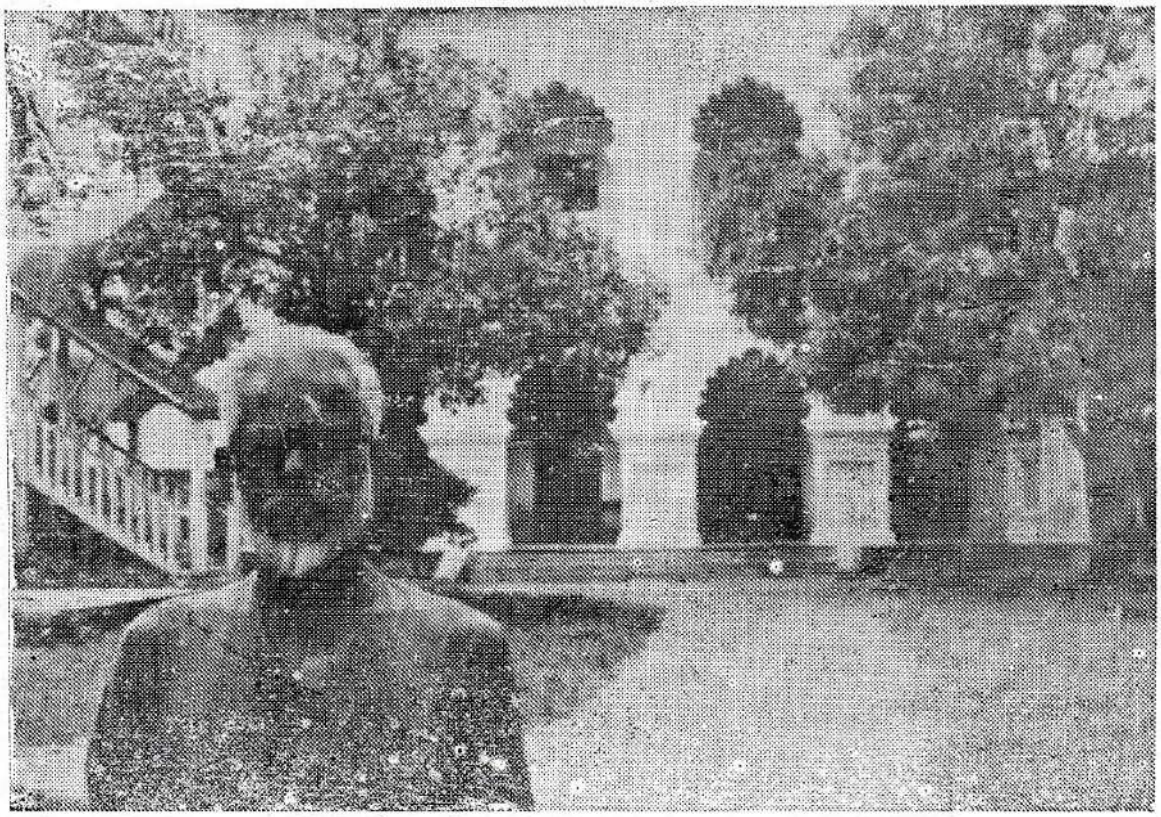

দাড়ানো : হোষ্টেল সুপারেন্টেন ইদ্রিস খান

ঢাকা গভঃ মুসলিম হাই স্কুল ছাত্রাবাস

স্থাপিত—১৯০৬ সন

বিদ্যালয় ভবন

ঢাকা গভঃ মুসলিম হাই স্কুল

স্কুল পরিক্রমা

ঢাকা গভঃ মুসলিম হাই স্কুল রাজধানীর বিদ্যালয় সমূহের মধ্যে অন্যতম প্রাচীন স্কুল। স্কুলের ভবন বিলুপ্তির পর তিন তলা ভবন নির্মিত হয়েছে। এ ব্যাপারে কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

উপাসনালয়ঃ সরকার রাষ্ট্র ধর্ম ইসলাম ঘোষণা করে দেশের জনগণের কাছে ধন্যবাদই হয়েছেন কিন্তু মুসলিম হাই স্কুলে নামাজের জন্য নির্ধারিত স্থান নেই। আপাততঃ স্কুলের জ্যামনিসিয়ামের, এক কোনে নামাযের জন্য একটুস্থান নির্ধারণ করা হয়েছে।

গ্রন্থাগারঃ অত্র স্কুলের গ্রন্থগারটি বিভিন্ন গ্রন্থরাজিতে সমৃদ্ধ। বাংলা, ইংরেজী, আরবী, ফার্শী ও উর্দু ভাষায় রচিত বহু দুষ্পাপ্য গ্রন্থের সমাবেশ রয়েছে এই গ্রন্থগারে। ক্লাসের ধরাবাঁধা পাঠ্য সূচীর অন্তর্ভুক্ত বই পুস্তক ছাড়া আরো কিছু শিক্ষার আগ্রহ থাকে সকলেরই। কিন্তু তা ক্রয় করে পড়ার সংহতি থাকে না অনেকেরই। ছাত্রছাত্রীদের জানার আগ্রহকে সামনে রেখেই প্রতিটি শিক্ষানিকেতনে গ্রন্থাগারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। গ্রন্থগার সভ্যতার প্রদীপ্ত মশাল, সেই আলোতে শান্তি সুখের পথ খুঁজে পাওয়া যায় আর আলোকিত করা যায় মনের গহীন অন্ধকারকে। সুদূর অতীত কাল থেকে জ্ঞান তাপসরা গ্রন্থগার থেকে বই ধার নিয়ে পড়ে মানব সভ্যতাকে এতদূর এগিয়ে নিয়ে এসেছেন।

প্রারম্ভিক সমাবেশঃ স্কুলের প্রাঙ্গনে প্রতিদিন নিয়মিত প্রারম্ভিক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। ছাত্র-শিক্ষক সকলের উপস্থিতে বাধ্যতামূলক। এতে ছাত্রগণ কুরআন তেলাওয়াত এবং শপথ গ্রহণ করে। জাতীয় সঙ্গীত পাঠান্তে সমাবেশের কাজ সমাপ্ত হয়। মাঝে মধ্যে প্রধান শিক্ষক সাহেব জরুরী উপদেশাবলী প্রদান করে থাকেন। মাঝে মাঝে শরীর চর্চা মহড়া চলে।

ধর্মীয় কার্যালয়ঃ প্রতি বছর বিদ্যালয়ে ঈদ-ই মিলাদুন নবী অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষে হামদ, না'ত, গজল, তিলাওয়াত-ই-কালাম পাঠ এবং বিভিন্ন গ্রুপে মহানবী (সাঃ) এর জীবনাদর্শের রচনা প্রতিযোগীতা অনুষ্ঠিত হয়। দেশের প্রখ্যাত আলেম প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন এবং মহানবী (সাঃ) এর জীবনী আলোচনা করেন। ১৯৮৯ সালে জাতীয় মসজিদ বায়তুল মুকারমের স্বনাম ধন্য খতিব আল হাজ্ব মাওলানা ওবাদুল হক সাহেব অনুষ্ঠানের তসরিফ আনেন এবং ছাত্রদের উদ্দেশ্যে হৃদয়গ্রাহী বক্তব্য রাখেন। পরিশেষে প্রতিযোগীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন।

বার্ষিক পুরস্কার বিতরণ ও প্রতিষ্ঠানিক বৃত্তিপ্রদান ঃ প্রতি বছর বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান স্বাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। বার্ষিক পরীক্ষায় ১ম, ২য় এবং তৃতীয় স্থান অধিকারী ছাত্রদেরকে পুরস্কার প্রদান করা হয়।

১৯৮৪ সাল থেকে বার্ষিক পরীক্ষায় শতকরা ৭০% নম্বর প্রাপ্ত ছাত্রকে সীরাত ফাণ্ড থেকে প্রতিষ্ঠানিক বৃত্তি প্রদান করা হয়। নবম-দশম শ্রেণীর প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় স্থান অধিকারীর জন্য যথাক্রমে সত্তর, ষাট এবং পঞ্চাশ টাকা বরাদ্দ, ৮ম শ্রেণী থেকে পঞ্চম শ্রেণী, পর্যন্ত প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় স্থান অধিকারীর জন্য যথাক্রমে চল্লিশ, পঁয়ত্রিশ এবং ত্রিশ টাকা বরাদ্দ রয়েছে। এই বৃত্তির প্রচলিত হওয়ায় ছাত্রদের মধ্যে তীব্র প্রতিযোগীতা পরিলক্ষিত হচ্ছে।

স্কাউট ঃ ছাত্রদের মধ্যে সেবামূলক মনোবৃত্তি গড়ে তোলার জন্য স্কুলের জন্ম লগ্ন থেকে স্কাউটিং ব্যবস্থাপনা চালু রয়েছে। আমাদের স্কাউট দল আর্ন্তজাতিক জাম্বুরীতে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে, নিয়মিত স্কাউট দলের প্রশিক্ষন চলে এবং মাঝে মাঝে স্কুলেই ক্যাপিং এর মাধ্যমে মহড়া চলতে থাকে।

বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগীতা ঃ প্রতি বছর শিক্ষা বছরের প্রথম ভাগেই বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগীতা অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিযোগীগণ বিভিন্ন খেলায় স্বতঃস্ফুর্ত ভাবে অংশ গ্রহণ করে। খেলোয়াড়দের মধ্যে ১ম, ২য় ও ৩য় বিজয়ীকে পুরস্কার প্রদান করা হয়। ১৯৯০ সালে ঢাকা আঞ্চলিক শিক্ষা পরিচালক মিসেস আফরোজা বেগম প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন। তিনি ছাত্রদের উদ্দেশ্যে মূল্য-বান বক্তব্য পেশ করেন এবং তিনি অনুষ্ঠান শেষে বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন।

পরীক্ষার্থীদের বিদায় সম্বার্ধনা ঃ আসা আর যাওয়া নিয়তির অমোঘ নিয়ম। স্কুল জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে এস, এস, সি পরীক্ষা উত্তীর্নের মাধ্যমে। পরীক্ষার পূর্বেই পরীক্ষার্থীদের আনুষ্ঠানিক ভাবে বিদায় দেওয়া হয়। ১৯৯০ সালের পরীক্ষার্থীদের বিদায় অনুষ্ঠান সূচিত হয় ২২ শে মার্চ। অধ্যায়নরত ছাত্রবৃন্দ বিদায়ী ভাইদের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলী পত্র পাঠ ও বিতরণ করে। পবিত্র কালামে পাক পাঠ করেই অনুষ্ঠান শুরু করা হয়। না'ত-ই-রাসূল, কবিতা আবৃত্তি পরিবেশন করা হয়। বিদায়ী ছাত্ররা তাদের অনুগামীদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখেন। মাননীয় প্রধান শিক্ষক সাহেব সকল ছাত্রকে

নৈতিক ও ধর্মীয় আচরণের মাধ্যমে জীবন গড়ে তোলার নির্দেশ দেন। পরিশেষে তাদের কামিয়াবীর জন্য মুনাজাত করা হয়।

শিক্ষকদের বিদায় সংবর্ধনা ঃ ইতিমধ্যে স্কুলের কয়েক জন শিক্ষক শিক্ষিকা পদোন্নতি এবং গণস্বার্থে অন্যত্র বদলী হয়েছেন। তন্মধ্যে (১) মিসেস রেহনা খানম, সহকারী প্রধান শিক্ষক মিরপুর বাংলা মিডিয়াম স্কুল (২) জনাব শামসুদ্দীন আহমেদ সহকারী প্রধান শিক্ষক পদে উন্নত হয়ে নারায়নগঞ্জ সরকারী আই, টি. স্কুলে যোগদান করেন। জনাব শরফুদ্দীন সহকারী শিক্ষক মিসেস আনোয়ারা বেগম ও মিসেস শাহানা আক্তার স্বেচ্ছায় অন্যত্র বদলী হয়ে যান।

—০—

—ঃ সমাপ্ত ঃ—

* তুমি যদি জ্ঞানী লোকদের পরামর্শ অনুযায়ী জীবন গড়তে চাও, তাহলে তাদের কাছে থেকে যা শোন তা নোট করে রাখো। চার্লস মরিস

* কৃতিত্বপূর্ণ জীবন গড়ার একমাত্র মাধ্যম হলো খেলাধূলা। কেননা ত্রুটি পরাজয়ে আনন্দ বিজয়ে গৌরব এবং সর্বদা নিয়মানুবর্তিতা ও সুশৃঙ্খল শিক্ষা দেয়। শেরে বাংলা

স্মৃতিময়

দৈনন্দিন রুটিন

সময় সকাল থেকে	সুমন	রিতা	মফি
২ টা থেকে ৬ টা পর্যন্ত	আরবী পড়াও ব্যায়াম করা	নামাজ ও আরবী পড়া	নামাজ পড়াও ব্যায়াম করা
টা থেকে ৮.৩০মি. পর্যন্ত	পড়া লেখা	পড়া লেখা	পড়ালেখা ও কলেজে যাওয়
.৩০মি. থেকে ৯টা পর্যন্ত	সকালের নাস্তা খাওয়া	সকালের নাস্তা খাওয়া	ঐ
টা থেকে ১০ টা পর্যন্ত	বাজার করা ও অন্যান্য	স্কুলে যাওয়া	ঐ
০টা থেকে ১২ টা পর্যন্ত	অংক করা	ঐ	ঐ
২ টা থেকে ১২.৩০মি. পর্যন্ত	গোছল করা	গোছল করা	নাই
.৩০মি. থেকে ১টা পর্যন্ত	খাওয়া দাওয়া	নাই	গোছল করা
টা থেকে ২টা পর্যন্ত	স্কুলে যাওয়া	খাওয়া দাওয়া	নামাজ পড়াওখাওয়া-দাও
টা থেকে ৪টা পর্যন্ত	ঐ	অংক করা	ঘুম
টা থেকে ৬টা পর্যন্ত	খেলাধুলা	খেলাধুলা	অংক করা ও অন্যান্য
্যা থেকে ৮.৩০মি. পর্যন্ত	পড়ালেখা	পড়ালেখা	পড়ালেখা
৩০মি. থেকে ৯টা পর্যন্ত	খাওয়া - দাওয়া	খাওয়া - দাওয়া	খাওয়া - দাওয়া
টা থেকে ১০টা পর্যন্ত	টিভি দেখা	টিভি দেখা	পড়ালেখা
টা থেকে - - -	ঘুম	ঘুম	পড়ালেখা অতঃপর ঘুম

১। কেন ভালবাসি, হ।
২। ও নয়ন পাখীর – আশংকা
৩। পাহাড়ের কান্না দেখে – নন্দী
৪। চাঁদমালা ও সাগর সাথে –
৫। হাজার মানুষ আছে প্রেম – নন্দী
৬। সবাই তো বাঁচতে চায় – কাজী
৭। তুমি যাবে চিত্তখানা –
৮। আমি আকাশ নীল রং আর সেথে –
৯। মধুর মঞ্জুর আমার মন বসবে না যদি
তোমাকে হারাই –
১০। সাদা কাগজের মূল্য কি আছে – আনিকুল
১১। চোখের আড়াল হইলে পরে সেই
পিরীতি হয় সয় – রুনা
১২। তোমরা ভুলে গেছ – রফিকুল
১৩। কথা দাও কথাগুলো যেতে
দেবে না – নন্দী
১৪। সুখ তুমি কি আমার বাঁচতে ইচ্ছে হয়
১৫। লিখেছি আর নাই আসিতে – আপেল
১৬। বাতাসে কেন এত সৌরভ ছিল সেই
দিন উতলা কত মন নিয়ে – শাহনাজ
১৭। দুঃখ আমার, আমার অন্তর কাঁদে
বারোমাস – সাবিনা
১৮। এক হৃদয় হীরার কাছে হৃদয়ের দাম কি আছে
– রফিকুল
১৯। স্বপ্নে ভুবন আমি আজো পরবাসী – মাসুদ
২০। হৃদয় সৃষ্টি এত ভালোবাসা – রুনা
২১। অনেক রাতে তোমার কথা যে – জব্বার
২২। তোমাকে যেন ভুলি না যদি –
২৩। ভ্রমরা হয়ে নয়নতারা ... ১২ –
সাবিনা ...